স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

গীতা-প্রসঙ্গ

স্বামী বিবেকানন্দ

সূচিপত্র

গীতা–১ 2
গীতা–২ 15
গীতা–৩ 23

গীতা—১

[১৯০০ খ্রীঃ ২৬ মে সান ফ্রান্সিস্কোতে প্রদত্ত বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত অনুলিপি]

গীতা বুঝিতে হইলে ইহার ঐতিহাসিক পটভূমি বোঝা প্রয়োজন। গীতা উপনিষদের ভাষ্য। উপনিষদ্ ভারতের একটি প্রধান ধর্মগ্রন্থ—খ্রীষ্টান জগতে নিউ টেষ্টামেণ্টের মত ভারতে ইহার স্থান। উপনিষদের সংখ্যা একশতেরও অধিক, কোনটি ছোট এবং কোনটি বড় হইলেও প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র গ্রন্থ। উপনিষদ্ কোন ঋষি বা আচার্যের জীবন-কাহিনী নয়, ইহার বিষয়বস্তু আত্মতত্ত্ব। উপনিষদের সূত্রসমূহ রাজাদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিদ্বৎসভায় আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। 'উপনিষদ্' শব্দের একটি অর্থ—(আচার্যের নিকট) উপবেশন। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা উপনিষদ্ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, ইহাদিগকে কেন সংক্ষিপ্ত সাঙ্কেতিক বিবরণ বলা হয়। দীর্ঘ আলোচনা সমাপ্ত হইবার পর সাধারণতঃ স্মরণ করিয়া এগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। পূর্বাপর সম্বন্ধ বা পটভূমি নাই বলিলেই হয়। জ্ঞানগর্ভ বিষয়গুলি শুধু উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি খ্রীষ্টের ৫০০০ বৎসর পূর্বে। উপনিষদগুলি ইহারও অন্তত দুই হাজার বৎসর আগেকার—ঠিক কখন ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে, কেহ বলিতে পারে না। উপনিষদের ভাবগুলিই গীতায় গৃহীত হইয়াছে—কোন কোন ক্ষেত্রে হুবহু শব্দ পর্যন্ত। সেগুলি এমনিভাবে গ্রথিত যে, সমগ্র উপনিষদের বিষয়বস্তুটি যেন সুসম্বন্ধ, সংক্ষিপ্ত ও ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

হিন্দুদের মূল ধর্মগ্রন্থ বেদ। এত বিরাট যে, যদি ইহার শ্লোকগুলি একত্র করা হয়, তবে এই বক্তৃতা-গৃহটিতে স্থান-সঙ্কুলান হইবে না। ইহা ছাড়া কিছু নষ্টও হইয়া গিয়াছে। বেদ বহু শাখায় বিভক্ত; এক একটি ঋষি-সম্প্রদায় ছিলেন এক একটি শাখার ধারক ও বাহক। ঋষিগণ স্মৃতিশক্তির সাহায্যে শাখাগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। ভারতবর্ষে এখনও অনেকে আছেন, যাঁহারা উচ্চারণের কিছুমাত্র ভুল না করিয়া বেদের অধ্যায়ের পর অধ্যায়

আবৃত্তি করিতে পারেন। বেদের বৃহত্তর অংশ এখন আর পাওয়া যায় না, কিন্তু যে অংশ পাওয়া যায়, তাহা লইয়াই একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার হইতে পারে। বেদের প্রাচীনতম অংশে ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি পাওয়া যায়। বৈদিক রচনাবলীর পারম্পর্য-নির্ণয়ের জন্য আধুনিক গবেষকদের একটি ঝোঁক দেখা যায়—কিন্তু এ বিষয়ে গোঁড়া ও প্রাচীনপন্থীদের ধারণা অন্যরূপ, যেমন বাইবেল সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা আধুনিক গবেষকদের মত হইতে ভিন্ন। বেদকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ একটি দার্শনিক অংশ—উপনিষদ্, অন্যটি কর্মকাণ্ড।

কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে এখন একটি মোটামুটি ধারণা দেবার চেষ্টা করা যাক। অনুষ্ঠান-বিধি ও স্তবস্তুতি লইয়াই কর্মকাণ্ড; বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে বিভিন্ন স্তব। কর্মকাণ্ডের মধ্যে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান-সম্পর্কিত বিধিসমূহ পাওয়া যায়—উহাদের কতকগুলি বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। বহু হোতা ও পুরোহিতের আবশ্যক। যাগযজ্ঞের বিশদ অনুষ্ঠানের জন্য হোতা, ঋত্বিক প্রভৃতির কার্য একটি বিশেষ বিজ্ঞানে পরিণত হয়। ক্রমশঃ এইসব স্তব ও যাগযজ্ঞকে কেন্দ্র করিয়া সর্বসাধারণের মধ্যে একটা শ্রদ্ধার ভাব গড়িয়া উঠে। দেবতাগণ তখন অন্তর্হিত হন এবং যাগযজ্ঞই তাঁহাদের স্থান অধিকার করে। ভারতে ইহা এক অদ্ভুত ক্রমপরিণতি। গোঁড়া হিন্দু (মীমাংসক) দেবতায় বিশ্বাসী নন, যাঁহারা গোঁড়া নন, তাঁহারা দেবতায় বিশ্বাসী। নিষ্ঠাবান হিন্দুকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, বেদে উল্লিখিত দেবতাগণের তাৎপর্য কি, তাহা হইলে তিনি ইহার সদুত্তর দিতে পারিবেন না। পুরোহিতরা মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। গোঁড়া হিন্দুদিগকে ইহার তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, শব্দের এমন একটি শক্তি আছে, যাহা দ্বারা বিশেষ ফল উৎপন্ন হয়, এই পর্যন্ত। প্রাকৃতিক ও অতি-প্রাকৃতিক সমস্ত শক্তিই উহার মধ্যে আছে। অতএব বেদ হইল শব্দরাশি, যাহার উচ্চারণ নির্ভুল হইলে আশ্চর্য ফল উৎপন্ন হইতে পারে। একটি শব্দও ভুল উচ্চারণ হইলে চলিবে না। প্রত্যেকটি শব্দ বিধিমত উচ্চারণ হওয়া প্রয়োজন। এইরূপে অন্যান্য ধর্মে যাহাকে প্রার্থনা বলা হয়, তাহা অন্তর্হিত হইল এবং বেদই দেবতারূপে পরিণত হইল। কাজেই দেখা যাইতেছে, এ মতে বেদে শব্দরাশির উপর বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এগুলি হইল শাশ্বত শব্দরাশি, যাহা হইতে সমগ্র জগৎ

উৎপন্ন হইয়াছে। শব্দ ছাড়া কোন চিন্তার অভিব্যক্তি হয় না। এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তাহা চিন্তারই অভিব্যক্তি এবং চিন্তা ব্যক্ত হয় কেবলমাত্র শব্দের সাহায্যে। যে শব্দরাশি দ্বারা অব্যক্ত চিন্তা ব্যক্ত হয়, তাহাই বেদ। অতএব বলা যায়, প্রত্যেকটি বস্তুর বাহিরের যে অস্তিত্ব, তাহা নির্ভর করে বেদের উপর, কারণ শব্দ ছাড়া চিন্তার অভিব্যক্তি সম্ভব নয়। যদি 'অশ্ব' শব্দটি না থাকিত, তবে কেহই অশ্ব সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারিত না। অতএব চিন্তা শব্দ ও বস্তুর মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা চাই। প্রকৃতপক্ষে এই শব্দগুলি কি? এগুলি বেদ। হিন্দুরা এই ভাষাকে মোটেই সংস্কৃত বলেন না; ইহা বৈদিক বা দেবভাষা। সংস্কৃত তাহার একটি বিকৃত রূপ; অন্যান্য ভাষাগুলিও তাহাই। বৈদিক ভাষা হইতে প্রাচীনতর আর কোন ভাষা নাই। আপনারা প্রশ্ন করিতে পারেন—বেদসমূহের রচয়িতা কে? এগুলি কাহারও দ্বারা লিখিত হয় নাই। শব্দরাশিই বেদ। একটি শব্দই বেদ, যদি আমি ঠিকভাবে তাহা উচ্চারণ করিতে পারি। ঠিকভাবে উচ্চারিত হইলে তৎক্ষণাৎ উহা বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিবে।

এই বেদরাশি অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান এবং এই শব্দরাশি হইতে সমগ্র জগৎ অভিব্যক্ত। কল্পান্তে এই সব শক্তির প্রকাশ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া প্রথমে কেবল শব্দে এবং পরে চিন্তায় লীন হইয়া যায়। পরবর্তী কল্পে চিন্তা প্রথমে শব্দরাশিতে ব্যক্ত হয় এবং পরে শব্দগুলি হইতে সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এইজন্য যাহা বেদে নাই, তাহার অস্তিত্ব অসম্ভব, তাহা ভ্রান্তিমাত্র। বেদের এই অপৌরুষেয়ত্ব প্রতিপাদনের জন্য বহু গ্রন্থ আছে। যদি আপনারা বলেন, বেদ মানুষের দ্বারা রচিত, তাহা হইলে এই সব গ্রন্থের রচয়িতাদের নিকট আপনারা হাস্যাপদ হইবেন। মানুষের দ্বারা বেদ প্রথমে সৃষ্ট হইয়াছিল—এ কথার উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। বুদ্ধদেবের কথা ধরা যাক, প্রবাদ আছে, তিনি বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে বহুবার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বেদপাঠও করিয়াছিলেন। যদি খ্রীষ্টান বলে, 'আমার ধর্ম ঐতিহাসিক ধর্ম এবং সে জন্যই উহা সত্য, আর তোমার ধর্ম মিথ্যা।' মীমাংসক উত্তর দিবেন, 'তোমার ধর্মের একটা ইতিহাস আছে এবং তুমি নিজেই স্বীকার করিতেছ, কোন মানুষ উনিশ শত বৎসর পূর্বে ইহা আবিষ্কার করিয়াছে।' যাহা সত্য, তাহা অসীম ও সনাতন। ইহাই সত্যের একমাত্র লক্ষণ। সত্যের

কখনও বিনাশ নাই—ইহা সর্বত্র একরূপ। তুমি স্বীকার করিতেছ, তোমার ধর্ম কোন-না-কোন ব্যক্তির দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিল। বেদ কিন্তু সেরূপ নয়; কোন অবতার বা মহাপুরুষ দ্বারা উহা সৃষ্ট নয়। বেদ অনন্ত শব্দরাশি—স্বভাবতঃ যে শব্দগুলি শাশ্বত ও সনাতন, সেগুলি হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি ও সেইগুলিতেই ইহার লয় হইতেছে। তত্ত্বের দিক্ দিয়া ইহা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। ... সৃষ্টির আদিতে শব্দের তরঙ্গ। জীবনসৃষ্টির আদিতে জীবাণুর মত শব্দতরঙ্গেরও আদি-তরঙ্গ আছে। শব্দ ছাড়া কোন চিন্তা সম্ভব নয়।

যেখানে কোন বোধ চেতনা বা অনুভূতি আছে, সেখানে শব্দ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু যখন বলা হয়, চারখানি গ্রন্থই কেবল বেদ, তখন ভুল বলা হয়। তখন বৌদ্ধরা বলিবেন, 'আমাদের শাস্ত্রগুলিই বেদ, সেগুলি পরবর্তীকালে আমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছে।' তাহা সম্ভব নহে, প্রকৃতি এইভাবে কার্য করে না। প্রকৃতির নিয়মগুলি একটু একটু করিয়া প্রকাশিত হয় না। মাধ্যাকর্ষণ-নিয়মের খানিকটা আজ ও খানিকটা কাল প্রকাশিত হইবে, এরূপ হয় না। প্রত্যেকটি নিয়ম পরিপূর্ণ। নিয়মের ক্রমবিবর্তন মোটেই নাই। যাহা হইবার তাহা একেবারেই প্রকাশিত হইবে। 'নূতন ধর্ম', 'মহত্তর প্রেরণা' প্রভৃতি শব্দ নিতান্ত অর্থহীন। প্রকৃতির শতসহস্র নিয়ম থাকিতে পারে, মানুষ আজ পর্যন্ত তাহার অতি অল্পই হয়তো জানিয়াছে। তত্ত্বগুলি আছে, আমরা সেগুলি আবিষ্কার করি—এই মাত্র। প্রাচীন পুরোহিতকুল এই শব্দরাশির উচ্চারণ-বিধি অধিগত করিয়া দেবতাদের স্থানচ্যুত করিয়াছেন এবং তাহাদের স্থলে নিজদিগকে বসাইয়াছেন। তাঁহারা বলিলেনঃ শব্দের কি অদ্ভুত শক্তি, তাহা তোমরা জান না! ঐগুলি কিভাবে ব্যবহার করা যায়, আমরা জানি! এই পৃথিবীতে আমরাই জীবন্ত দেবতা। আমাদের অর্থ দাও। অর্থের বিনিময়ে আমরা বেদের শব্দরাশিকে এমন কাজে লাগাইব, যাহাতে তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। তোমরা কি নিজেরা বেদমন্ত্র যথাযথ উচ্চারণ করিতে পার? পার না; সাবধান, যদি একটিও ভুল কর, তবে ফল বিপরীত হইবে। তোমরা কি ধনবান্, ধীমান্ ও দীর্ঘায়ু হইতে চাও এবং মনোনীত পতি বা পত্নী লাভ করিতে চাও? তাহা হইলে পুরোহিতদের অর্থ দাও এবং চুপ করিয়া থাক।

আর একটি দিক্ আছে। বেদের প্রথম অংশের আদর্শ অপর অংশ উপনিষদের আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। প্রথম অংশের যে আদর্শ, তাহার সহিত এক বেদান্ত ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মের আদর্শের মিল আছে। ইহলোক ও পরলোকে ভোগই ইহার মূল কথা—স্বামী-স্ত্রী পুত্র কন্যা। অর্থ দাও, পুরোহিতরা তোমাকে ছাড়পত্র দিবেন—পরকালে স্বর্গে তুমি সুখে থাকিবে। সেখানেও তুমি সব আত্মীয়-স্বজনকে পাইবে এবং অনন্তকাল আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করিবে। অশ্রু নাই, দুঃখ নাই—শুধু হাসি আর আনন্দ। পেটের বেদনা নাই—যত পার খাও। মাথা-ব্যথা নাই, যত পার ভোজসভায় যোগদান কর। পুরোহিতদের মতে ইহাই মানব-জীবনের মহত্তম উদ্দেশ্য।

এই জীবন-দর্শনের অন্তর্ভুক্ত আর একটি বিষয়ের সহিত আধুনিক ভাবধারার অনেকখানি মিল আছে। মানুষ প্রকৃতির দাস এবং চিরকালই সে এইরূপ থাকিবে। আমরা ইহাকে ‘কর্ম’ বলি। কর্ম একটি নিয়ম; ইহা সর্বত্র প্রযোজ্য। পুরোহিতদের মতে সকলেই কর্মের অধীন। তবে কি কর্মের প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার উপায় নাই? তাঁহারা বলেন, ‘না। অনন্তকাল প্রকৃতির কৃতদাসরূপে থাকিতে হইবে—তবে সে দাসত্ব সুখের! যদি আমাদের উপযুক্ত দক্ষিণা দাও, তবে শব্দগুলি এমনভাবে ব্যবহার করিব, যাহাতে তোমরা পরকালে কেবল ভালটুকু পাইবে, মন্দটুকু নয়।’—মীমাংসকেরা এরূপ বলেন। যুগ যুগ ধরিয়া এইরূপ আদর্শই সাধারণের নিকট প্রিয় হইয়া আছে। জনসাধারণ কখনও চিন্তা করে না। যদি কেহ কখনও স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে চেষ্টা করে, তখন তাহাদের উপর কুসংস্কারের প্রচণ্ড চাপ পড়ে। এই দুর্বলতার জন্য বাইরের একটু আঘাত তাহাদের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া টুকরো টুকরো হইয়া যায়। প্রলোভন ও শাস্তির ভয় দ্বারা তাহারা চলিতে পারে না। সাধারণ লোককে ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিতে হইবে; চিরকাল ক্রীতদাস হইয়া তাহারা থাকিবে। পুরোহিতদের দক্ষিণা দেওয়া এবং তাহাদের মানিয়া চলা ছাড়া আর কোন কর্তব্য নাই—বাকী যাহা করণীয়, তাহা যেন পুরোহিতরাই করিয়া দিবেন। ধর্ম এইভাবে কতখানি সহজ হইয়া যায়! কারণ আপনাদের কিছুই করিবার নাই—বাড়ী গিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকুন। নিজেদের মুক্তিসাধনার সবই অপরে করিয়া দিবে। হায়, হতভাগ্য মানুষ!

পাশাপাশি আর একটি দার্শনিক চিন্তাধারাও ছিল। উপনিষদ্ কর্মকাণ্ডের সকল সিদ্ধান্তের একেবারে বিপরীত। প্রথমতঃ উপনিষদ্ বিশ্বাস করেন, এই বিশ্বের একজন স্রষ্টা আছেন– তিনি ঈশ্বর, সমস্ত বিশ্বের নিয়ামক। কালে তিনি কল্যাণময় ভাগ্যবিধাতায় পরিণত হন। এই ধারণা পূর্বের ধারণা হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। পুরোহিতরাও এ কথা বলেন, তবে এখানে ঈশ্বরের যে ধারণা, তাহা অতি সূক্ষ্ম। বহু দেবতার স্থলে এখানে এক ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ উপনিষদও স্বীকার করেন, কর্মের নিয়মে সকলে আবদ্ধ; কিন্তু নিয়মের হাত হইতে মুক্তিপথের সন্ধানও তাঁহারা দিয়াছেন। মানব জীবনের উদ্দেশ্য নিয়মের পারে যাওয়া। ভোগ কখনও জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না, কারণ ভোগ কেবল প্রকৃতির মধ্যেই সম্ভব।

তৃতীয়তঃ উপনিষদ্ যাগযজ্ঞের বিরোধী এবং উহাকে নিতান্ত হাস্যকর অনুষ্ঠান বলিয়া মনে করেন। যাগযজ্ঞের দ্বারা সকল ঈপ্সিত বস্তু লাভ হইতে পারে, কিন্তু ইহা মানুষের চরম কাম্য হইতে পারে না; কারণ মানুষ যতই পায় ততই চাই। ফলে মানব হাসি কান্নার অন্তহীন গোলকধাঁধায় চিরকাল ঘুরিতে থাকে–কখনও লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে না, অনন্ত সুখ কোথাও কখনও সম্ভব নহে, ইহা বালকের কল্পনা মাত্র। একই শক্তি সুখ ও দুঃখরূপে পরিণত হয়।

আজ আমার মনুষত্ব খানিকটা পরিবর্তন করিয়াছি। একটি অত্যন্ত অদ্ভুত সত্য আবিষ্কার করিয়াছি। অনেক সময় আমাদের মনে অনেক ভাব জাগে, যেগুলি আমরা চাই না; আমরা অন্য বিষয়ের চিন্তা দ্বারা ঐগুলি সম্পূর্ণভাবে চাপা দিতে চাই। সেই ভাবটা কি? দেখিতে পাই পনর মিনিটের মধ্যেই তাহা আবার মনে উদিত হয়। সেই ভাবটি এত প্রবল ও ভীষণভাবে আসিয়া মনে আঘাত করে যে, নিজেকে পাগল বলিয়াই মনে হয় এবং যখন এই ভাব প্রশমিত হয়, তখন দেখা যায় যে, পূর্বের ভাবটিকে শুধু চাপিয়া রাখা হইয়াছিল। মনে কী প্রকাশিত হইয়াছিল?–আমার নিজেরই যে খারাপ সংস্কারগুলি কার্যে পরিণত হইবার অপেক্ষায় ভিতরে সঞ্চিত ছিল, সেয়গুলিই। 'প্রাণিগণ নিজ নিজ প্রকৃতিকে

অনুসরণ করে। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কি করিতে পারে?’ গীতায় এইরূপ ভীষণ কথাই বলা হইয়াছে। কাজেই আমাদের সমস্ত সংগ্রাম—সমস্ত চেষ্টাই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ বলিয়া মনে হয়। মনের মধ্যে সহস্র প্রেরণা একই সময়ে প্রতিযোগিতা করিতেছে; তাহাদিগকে চাপিয়া রাখা যাইতে পারে, কিন্তু যখনই বাধা অপসারিত হয়, তখনই সমস্ত চিন্তাগুলি প্রকট হইয়া উঠে।

কিন্তু আশা আছে। যদি ক্ষমতা থাকে, তবে মনঃশক্তিকে একই সঙ্গে বহু অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। আমার চিন্তাধারা পরিবর্তন করিতেছি। মন ক্রমশঃ বিকশিত হয়—যোগীগণ এই কথাই বলেন। মনের একটি আবেগ আর একটি আবেগকে জাগ্রত করে, তখন প্রথমটি নষ্ট হইয়া যায়। যদি তুমি ক্রুদ্ধ হইবার পর মুহূর্তে সুখী হইতে পার, তবে পূর্বের ক্রোধ চলিয়া যাইবে। ক্রোধের মধ্য হইতে তোমার পরবর্তী অবস্থার উদ্ভব হইতেছে। মনের এই অবস্থাগুলি সর্বদাই পরিবর্তন-সাপেক্ষ। চিরস্থায়ী সুখ ও চিরস্থায়ী দুঃখ শিশুর স্বপ্নমাত্র। উপনিষদ্ বলেন, মানব-জীবনের উদ্দেশ্য দুঃখ নয়, সুখও নয়; কিন্তু যাহা হইতে এই সুখ ও দুঃখের উদ্ভব হইতেছে, তাহাকে বশীভূত করা। একেবারে গোড়াতেই যেন অবস্থাকে আমাদের আয়ত্তে আনিতে হইবে।

মতপার্থক্যের অন্য বিষয়টি এইঃ উপনিষদ্ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মগুলির—বিশেষতঃ পশুবলির সহিত সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানগুলির নিন্দা করেন। উপনিষদ্ বলেন, এই সব নিতান্তই নিরর্থক। প্রাচীন দার্শনিকদের এক সম্প্রদায় (মীমাংসকেরা) বলেন, কোন বিশেষ ফল পাইতে হইলে একটি বিশেষ সময়ে বিশেষ কোন পশুকে বলি দিতে হইবে। উত্তরে বলা যায়, ‘পশুটির প্রাণ লইবার জন্য তো পাপ হইতে পারে এবং তার জন্য শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।’ ঐ দার্শনিকরা বলেন, এসব বাজে কথা! কোন্টা পাপ কোন্টা পুণ্য—তাহা তুমি কি করিয়া জানিলে? তোমার মন বলিতেছে? তোমার মন কি বলে না বলে, তাহাতে অপরের কি আসে যায়? তোমার এ সকল কথার কোন অর্থ নাই—কারণ তুমি শাস্ত্রের বিরুদ্ধে চিন্তা করিতেছ। যদি তোমার মন এক কথা বলে এবং বেদ অন্য কথা বলেন, তবে তোমার মন সংযত করিয়া বেদের নির্দেশ শিরোধার্য কর। যদি বেদ বলেন,

নরহত্যা ঠিক, তবে তাহাই ঠিক। যদি তুমি বল, ‘না, আমার বিবেক অন্যরূপ বলে’—এ কথা বলা চলিবে না।

যে মুহূর্তে কোন গ্রন্থকে বিশেষ পবিত্র ও চিরন্তন বলিয়া বিশ্বাস করিলেন, তখন আর উহাকে সন্দেহ করিতে পারিবেন না। আমি বুঝিতে পারি না, এদেশের লোকেরা বাইবেলে পরম বিশ্বাসী হইয়াও কি করিয়া বলে—‘উপদেশগুলি কত সুন্দর, ন্যায়সঙ্গত ও কল্যাণকর!’ কারণ বাইবেল স্বয়ং ঈশ্বরের বাণী—এই বিশ্বাস যদি পাকা হয়, তবে তাহার ভালমন্দ বিচারের অধিকার—আপনাদের মোটেই নাই। যখন বিচার করিতে বসেন, তখন আপনারা ভাবেন—আপনারা বাইবেল অপেক্ষা বড়। সেক্ষেত্রে বাইবেলের প্রয়োজন কি? পুরোহিতেরা বলেন, ‘বাইবেল বা অন্য কাহারও সহিত তুলনা করিতে আমরা নারাজ। তুলনার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, কোন্‌টি প্রামাণিক? এই শেষ কথা। যদি কোন কিছুর সত্যতা সম্বন্ধে তোমার মনে সন্দেহ জাগে, তবে বেদের অনুশাসন অনুযায়ী তাহার যাথার্থ্য নির্ণয় করিয়া লও।’

উপনিষদ্‌ ইহা বিশ্বাস করেন, তবে সেখানে একটি উচ্চতর মানও আছে। একদিকে যেমন বেদের কর্মকাণ্ড তাহারা অস্বীকার করে না, তেমনি আবার অন্যদিকে তাহাদের দৃঢ় মত এই যে, পশুবলি এবং অপরের অর্থের প্রতি পুরোহিতকুলের লোভ অত্যন্ত অসঙ্গত। মনোবিজ্ঞানের দিক্‌ দিয়া উভয়ের ভিতরে অনেক মিল আছে বটে, তবে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে দার্শনিক মতানৈক্য বিদ্যমান। আত্মার কি দেহ ও মন আছে? মন কি কতকগুলি ক্রিয়াশীল ও সংজ্ঞাবহ স্নায়ুর সমষ্টি? সকলেই মানিয়া লয়, মনোবিজ্ঞান একটি নিখুঁত বিজ্ঞান; এ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। কিন্তু আত্মা ও ঈশ্বর প্রভৃতি ব্যাপারে দার্শনিক তত্ত্ব লইয়া উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব রহিয়াছে।

পুরোহিতকুল এবং উপনিষদের মধ্যে আর একটি বড় পার্থক্য আছে। উপনিষদ্‌ বলেন—ত্যাগ কর। ত্যাগই সব কিছুর কষ্টিপাথর। সব কিছু ত্যাগ কর। সৃষ্টি প্রক্রিয়া হইতেই সংসারের যাহা কিছু বন্ধন। মন সুস্থ হয় তখনই, যখন সে শান্ত। যে-মুহূর্তে মনকে শান্ত করিতে পারিবে, সেই মুহূর্তেই সত্যকে জানিতে পারিবে। মন যে এত চঞ্চল, তাহার কারণ

কি? কল্পনা ও সৃজনী প্রবৃত্তিই ইহার কারণ। সৃষ্টি বন্ধ কর, সত্য জানিতে পারিবে। সৃষ্টির সমস্ত শক্তি বন্ধ হইলেই সত্য জানা যায়।

অন্যদিকে পুরোহিতকুল সৃষ্টির পক্ষপাতী। এমন জীবের কল্পনা কর, যাহার মধ্যে সৃষ্টির কোন ক্রিয়াকলাপ নাই। এরকম অবস্থা চিন্তা করা যায় না। স্থায়ী সমাজ-বিবর্তনের জন্য মানুষকে একটি পরিকল্পনা করিতে হইয়াছিল। এইজন্য (বিবাহে) কঠোর নির্বাচন-প্রথা অবলম্বন করিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অন্ধ ও খঞ্জের বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। ফলে ভারতবর্ষে বিকলাঙ্গ লোকের সংখ্যা পৃথিবীর অন্য যে-কোন দেশ অপেক্ষা কম। মৃগীরোগী এবং পাগলের সংখ্যাও সেখানে কম। ইহার কারণ—প্রত্যক্ষ যৌন-নির্বাচন। পুরোহিতদের বিধান হইল—বিকলাঙ্গেরা সন্ন্যাসী হউক। অপরদিকে উপনিষদ্ বলেনঃ না, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে তাজা ও সুন্দর ফুলই পূজার বেদীতে অর্পণ করা কর্তব্য। আশিষ্ঠ দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ মেধাবী ও সুস্থতম ব্যক্তিরাই সত্যলাভের চেষ্টা করিবে।

এই সব মত-পার্থক্য সত্ত্বেও পুরোহিতরা নিজেদের একটি পৃথক্ জাতি-গোষ্ঠীতে (ব্রাহ্মণ) পরিণত করিয়াছে, এ কথা আমি আপনাদের আগেই বলিয়াছি। দ্বিতীয় হইল রাজপুরুষের জাতি (ক্ষত্রিয়)। উপনিষদের দর্শন রাজাদের মস্তিষ্ক হইতে প্রসূত, পুরোহিতদের মস্তিষ্ক হইতে নয়। প্রত্যেক ধর্মীয় আন্দোলনের মধ্য দিয়া একটি অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। মানুষ নামক জীবের উপর ধর্মের কিছু প্রভাব আছে বটে, কিন্তু অর্থনীতির দ্বারাই সে পরিচালিত হয়। ব্যষ্টির জীবনের উপর অন্য কিছুর প্রভাব থাকিতে পারে, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে মানুষের ভিতর যখনই কোন অভ্যুত্থান আসিয়াছে, তখনই দেখা গিয়াছে, আর্থিক সম্পর্ক ব্যতীত মানুষ কখনও সাড়া দেয় নাই। আপনি যে ধর্মমত প্রচার করিতেছেন, তাহা সর্বাঙ্গসুন্দর না হইতে পারে, কিন্তু যদি তাহার পশ্চাতে অর্থনৈতিক পটভূমি থাকে এবং কিছু সংখ্যক উৎসাহী সমর্থক ইহার প্রচারের জন্য বদ্ধপরিকর হয়, তবে আপনি একটি গোটা দেশকে আপনার ধর্মমতে আনিতে পারিবেন।

যখনই কোন ধর্মমত সফল হয়, তখন (বুঝিতে হইবে) অবশ্যই তাহার আর্থিক মূল্য আছে। একই ধরনের সহস্র সহস্র সম্প্রদায় ক্ষমতার জন্য সংগ্রাম করিলেও যে-সম্প্রদায়

আর্থিক সমস্যার সমাধান করিতে পারে, তাহাই প্রাধান্য লাভ করিবে। পেটের চিন্তা—অন্নের চিন্তা মানুষের প্রথম। অন্নের ব্যবস্থা প্রথমে, তারপর মস্তিষ্কের। মানুষ যখন হাঁটে, তখন তাহার পেট চলে আগে, মাথা চলে পরে। ইহা কি লক্ষ্য করেন নাই? মস্তিষ্কের অগ্রগতির জন্য এখনও কয়েক যুগ লাগিবে। ৬০ বৎসর হইলে মানুষ সংসার হইতে বিদায় লয়। সমগ্র জীবন একটা ভ্রান্তি। বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বুঝিবার মত বয়স হইতে না হইতে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। যতদিন পাকস্থলী সবল ছিল, ততদিন সব ঠিক ছিল। যখন বালসুলভ স্বপ্ন বিলীন হইয়া বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ দেখিবার সময় আসিল, তখন মস্তিষ্কের গতি শুরু হয়; এবং যখন মস্তিষ্কের ক্রিয়া প্রাধান্য লাভ করিল, তখন সংসার হইতে চলিয়া যাইতে হয়। তাই উপনিষদের ধর্মকে জনসাধারণের হৃদয়গ্রাহী করা বড় দুরূহ ব্যাপার। অর্থগত লাভ সেখানে খুব অল্প, কিন্তু পরার্থপরতা সেখানে প্রচুর।

উপনিষদের ধর্ম যদিও প্রভূত রাজশক্তির অধিকারী রাজন্যবর্গের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তবু ইহার রাজ্য বিস্তৃতি ছিল না। তাই সংগ্রাম প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়াছিল। প্রায় দুই হাজার বছর পরে বৌদ্ধধর্মের বিস্তারের সময় ইহা চূড়ান্ত অবস্থায় উপনীত হয়। বৌদ্ধধর্মের বীজ ছিল এই রাজা ও পুরোহিতের সাধারণ দ্বন্দ্বের মধ্যে। এই প্রতিযোগিতায় ধর্মের অবনতি হয়। একদল এই ধর্মকে ত্যাগ করিতে চাহিল, অন্যদল বৈদিক দেবতা, যজ্ঞ প্রভৃতিকে আঁকড়াইয়া থাকিতে চাহিল। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম জনসাধারণের শৃঙ্খল মোচন করিল। এক মুহূর্তে সকল জাতি ও সম্প্রদায় সমান হইয়া গেল। ধর্মের মহান্ তত্ত্বগুলি ভারতে এখনও বর্তমান, কিন্তু সেগুলি প্রচার করার কাজ এখনও বাকী আছে, অন্যথা সেই তত্ত্বগুলি দ্বারা কোন উপকার হইবে না।

দুইটি কারণে প্রত্যেক দেশেই পুরোহিতগণ গোঁড়া ও প্রাচীনপন্থী হয়। একটি কারণ—তাহাদের জীবিকা, অন্যটি—তাহাদিগকে জনসাধারণের সঙ্গে চলিতে হয়। তাহা ছাড়া পুরোহিতদের মন সবল নয়। যদি জনসাধারণ বলে, ‘দুই হাজার দেবতার কথা প্রচার কর’, পুরোহিতরা তাহাই করিবে। যে জনমণ্ডলী তাহাদের টাকা দেয়, পুরোহিতরা তাহাদের আজ্ঞাবহ ভৃত্যমাত্র, ভগবান্ তো টাকা দেন না; কাজেই পুরোহিতদের দোষ

দেওয়ার পূর্বে নিজেদেরই দোষ দিন। আপনারা যেরূপ শাসন, ধর্ম ও পুরোহিতকুল পাইবার উপযুক্ত, সেইরূপই পাইবেন। ইহা অপেক্ষা ভাল কিছু পাওয়া আপনাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

এই সংঘর্ষ ভারতবর্ষেও আরম্ভ হইয়াছিল এবং ইহার একটি চূড়ান্ত অবস্থা দেখা গেল গীতাতে। যখন সমগ্র ভারতবর্ষ দুইটি বিদ্যমান দলে বিভক্ত হইবার আশঙ্কা দেখা দিল–তখন এই বিরাট পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। তিনি গীতার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ এবং পুরোহিত ও জনসাধারণের ধর্মমতের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধন করেন। আপনারা যীশুখ্রীষ্টকে যেমন শ্রদ্ধা ও পূজা করেন, শ্রীকৃষ্ণকেও তেমনি ভারতবর্ষের লোক শ্রদ্ধা ও পূজা করেন। শুধু যুগের ব্যবধান মাত্র। আপনাদের দেশে ক্রীস্‌মাসের মত হিন্দুরা শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি (জন্মাষ্টমী) পালন করেন। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে। তাঁহার জীবনে বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে; সেগুলির কিছু কিছু যীশুখ্রীষ্টের জীবনীর সহিত মিলিয়া যায়। কারাগারেই শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল। পিতা শিশুকে লইয়া পলায়ন করেন এবং গোপগোপীদের নিকট তাঁহার পালনের ভার অর্পণ করেন। সেই বৎসরে যত শিশু জন্মিয়াছিল, সকলকেই হত্যা করার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল এবং জীবনের শেষভাগে তাঁহাকে অপরের হাতে প্রাণ দিতে হইয়াছিল–ইহাই নিয়তি।

শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সেগুলি সম্বন্ধে আমরা তত আগ্রহ নাই। অতিরঞ্জন-দোষ হিন্দুদেরও আছে। খ্রীষ্টান মিশনরীরা যদি বাইবেলের একটি গল্প বলে, হিন্দুরা বিশটি গল্প বলিবে। আপনারা যদি বলেন, তিমিমাছ জোনা-কে গলাধঃকরণ করিয়াছিল–হিন্দুরা বলিবেন, তাহাদের কেহ না কেহ একটি হাতীকে গিলিয়াছিল। ... বাল্যকাল হইতে আমি শ্রীকৃষ্ণের জীবন সম্পর্কে অনেক কথা শুনিয়াছি। আমি ধরিয়া লইতেছি, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া কেহ একজন ছিলেন এবং গীতা তাঁহার অপূর্ব গ্রন্থ। এ কথা অনস্বীকার্য যে, গল্প বা উপকথাগুলি বিশ্লেষণ করিলে এই ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়। উপকথাগুলি অলঙ্কারের কাজ করে। স্বভাবতই

সেগুলি যতটা সম্ভব সুশোভন করা হয় এবং আলোচ্য ব্যক্তির চরিত্রের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লওয়া হয়। বুদ্ধদেবের কথা ধরা যাক—ত্যাগই কেন্দ্রগত ভাব; হাজার হাজার উপকথা রচিত হইয়াছে এবং প্রত্যেকটিতে ঐ ত্যাগের মাহাত্ম্য ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। লিঙ্কনের মহান্ জীবনের এক-একটি ঘটনা লইয়া বহু গল্প রচিত হইয়াছে। গল্পগুলি বিশ্লেষণ করিলে একটি সাধারণ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। উহার মধ্যে ঐ ব্যক্তির চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যকে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল অনাসক্তি। তাঁহার কোন ব্যক্তিগত প্রয়োজন নাই, কোন অভাবও তাঁহার নাই। কর্মের জন্যই তিনি কর্ম করেন। 'কর্মের জন্যই কর্ম কর। পূজার জন্য পূজা কর। পরোপকার কর—কারণ, পরোপকার মহৎ কাজ; এর বেশী কিছু চাহিও না।' ইহাই শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র। অন্যথা এই উপকথাগুলিকে সেই অনাসক্তির আদর্শের সঙ্গে খাপ খাওয়ান যায় না। গীতা তাঁহার একমাত্র উপদেশ নয়।

আমি যত মানুষের কথা জানি, তাহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর। তাঁহার মধ্যে মস্তিষ্কের উৎকর্ষতা, হৃদয়বত্তা ও কর্মনৈপুণ্য সমভাবে বিকশিত হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের প্রতি মুহূর্ত নাগরিক, যোদ্ধা, মন্ত্রী অথবা অন্য কোন দায়িত্বশীল পুরুষের কর্মপ্রবণতায় প্রাণবন্ত। বিদ্যাবত্তা, কবি-প্রতিভা, ভদ্র ব্যবহার—সব দিক্ দিয়াই তিনি ছিলেন মহান্। গীতা ও অন্যান্য গ্রন্থে এই সর্বাঙ্গীণ ও বিস্ময়কর কর্মশীলতা এবং মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের অপূর্ব সমন্বয়ের কথা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গীতায় যে হৃদয়বত্তা ও ভাষার মাধুর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা অপূর্ব ও অনবদ্য। এই মহান্ ব্যক্তির প্রচণ্ড কর্মক্ষমতার পরিচয় এখনও দেখা যায়। পাঁচ হাজার বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে—আজও কোটি কোটি লোক তাঁহার বাণীতে অনুপ্রাণিত হইতেছে। চিন্তা করুন—আপনারা তাঁহাকে জানুন বা না জানুন—সমগ্র জগতে তাঁহার চরিত্রের প্রভাব কত গভীর! তাঁহার পূর্ণাঙ্গ প্রজ্ঞাকে আমি পরম শ্রদ্ধা করি। কোন প্রকার জটিলতা, কোন প্রকার কুসংস্কার সেই চরিত্রে দৃষ্ট হয় না। জগতের প্রত্যেক বস্তুর একটি নিজস্ব স্থান আছে, এবং তিনি তাহার যোগ্য মর্যাদা দিতে জানিতেন। যাহারা কেবল তর্ক করে এবং বেদের মহিমা সম্বন্ধে সন্দেহ করে, তাহারা সত্যকে

জানিতে পারে না; তাহারা ভণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নয়। কুসংস্কার এবং অজ্ঞতারও স্থান বেদে আছে। প্রত্যেক বস্তুর যথাযথ স্থান নির্ণয় করাই প্রকৃত রহস্য।

তারপর হৃদয়বত্তা! বুদ্ধদেবেরও পূর্ববর্তী শ্রীকৃষ্ণই সকল সম্প্রদায়ের নিকট ধর্মের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। মনঃশক্তি এবং প্রচণ্ড কর্মপ্রবণতার কী অপূর্ব বিকাশ! বুদ্ধদেবের কর্মক্ষমতা একটি বিশেষ স্তরে পরিচালিত হইত—উহা আচার্যের স্তর। তিনি স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিলেন, নতুবা আচার্যের কাজ করা সম্ভব নহে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া উপদেশ দিতেছেন! যিনি প্রবল কর্মব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে একান্তভাবে শান্ত রাখেন এবং যিনি গভীর শান্তির মধ্যে কর্মপ্রবণতা দেখান, তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী ও জ্ঞানী। যুদ্ধক্ষেত্রের অস্ত্রশস্ত্র এই মহাপুরুষ ভ্রূক্ষেপ করেন না। সংগ্রামের মধ্যেও তিনি ধীর স্থিরভাবে জীবন ও মৃত্যুর সমস্যাসমূহ আলোচনা করেন। প্রত্যেক অবতারই তাঁহার উপদেশের জীবন্ত উদাহরণ। নিউ টেষ্টামেন্টের উপদেশের তাৎপর্য জানিবার জন্য আপনারা কাহারও না কাহারও নিকট যাইয়া থাকেন। তাহার পরিবর্তে নিজেরা উহা বার বার পড়ুন এবং খ্রীষ্টের অপূর্ব জীবনালোকে উহা বুঝিতে চেষ্টা করুন।

মনীষীরা চিন্তা করেন এবং আমরাও চিন্তা করি। কিন্তু তাহার মধ্যে পার্থক্য আছে। আমাদের মন যাহা চিন্তা করে, শরীর তাহা অনুসরণ করে না। আমাদের কার্য ও চিন্তার মধ্যে সামঞ্জস্য নাই। যে শক্তির বলে 'শব্দ' বেদ হয়, আমাদের কথায় সে শক্তি নাই। কিন্তু ঋষি বা মনীষীরা যাহা চিন্তা করেন, তাহা অবশ্যই কর্মে পরিণত হয়। যদি তাঁহারা বলেন, 'আমি ইহা করিব' তবে তাঁহাদের শরীর সেই কাজ করিবেই। পরিপূর্ণ আজ্ঞাবহতা—ইহাই লক্ষ্য। আপনি এক মুহূর্তে নিজেকে ঈশ্বর কল্পনা করিতে পারেন, কিন্তু আপনি ঈশ্বর হইতে পারেন না—বিপদ এখানেই। মনীষীরা যাহা চিন্তা করেন, তাহাই হন—আমাদের চিন্তাকে কার্যে পরিণত করিতে অনেক সময় প্রয়োজন।

আমরা এতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার সমসাময়িক যুগের কথা আলোচনা করিলাম। পরবর্তী বক্তৃতায় 'গীতা' সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জানিতে পারিব।

গীতা—২

[১৯০০ খ্রীঃ ২৮ মে সান ফ্রান্সিস্কোতে প্রদত্ত বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত অনুলিপি]

গীতা সম্বন্ধে প্রথমেই কিছু ভূমিকার প্রয়োজন। দৃশ্য—কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গণ। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের আধিপত্য লাভের জন্য একই রাজবংশের দুইটি শাখা—কুরু ও পাণ্ডব যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিল। পাণ্ডবদের ছিল রাজ্যে ন্যায়সঙ্গত অধিকার, কৌরবদের ছিল বাহুবল। পাণ্ডবদের পাঁচ ভ্রাতা এতদিন বনে বাস করিতেছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন তাঁহাদের সখা। কৌরবেরা পাণ্ডবদিগকে সূচ্যগ্র মেদিনী দিতেও রাজী হইল না।

গীতায় প্রথম দৃশ্যটি যুদ্ধক্ষেত্রের। উভয় দিকে আছেন আত্মীয়স্বজন ও জ্ঞাতিবন্ধুরা—এক পক্ষে কৌরব-ভ্রাতৃগণ, অপর পক্ষে পাণ্ডবেরা। একদিকে পিতামহ ভীষ্ম, অন্যদিকে পৌত্রগণ। বিপক্ষদলে তাঁহার জ্ঞাতি বন্ধু ও আত্মীয়দের দেখিয়া এবং (যুদ্ধক্ষেত্রে) তাহাদিগকে বধ করিতে হইবে—এ-কথা চিন্তা করিয়া অর্জুন বিমর্ষ হইলেন এবং অস্ত্রত্যাগ করাই স্থির করিলেন। বস্তুতঃ এইখানেই গীতার আরম্ভ।

পৃথিবীতে আমাদের সকলেরই জীবন এক বিরামহীন সংগ্রাম। অনেক সময় আমরা আমাদের দুর্বলতা ও কাপুরুষতাকে ক্ষমা ও ত্যাগ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চাই। কিন্তু ভিক্ষুকের ত্যাগে কোন কৃতিত্ব নাই। আঘাত করিতে সমর্থ কোন মানুষ যদি সহিয়া যায়, তবে তাহাতে কৃতিত্ব আছে; যাহার কিছু আছে, সে যদি ত্যাগ করে, তবে তাহাতে মহত্ত্ব আছে। আমরা তো জানি আমাদের জীবনেই কতবার আমরা আলস্য ও ভীরুতার জন্য সংগ্রাম ত্যাগ করিয়াছি, আর আমরা সাহসী—এই মিথ্যা বিশ্বাসে নিজেদের মনকে সম্মোহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

‘হে ভারত (অর্জুন), উঠ, হৃদয়ের এই দুর্বলতা ত্যাগ কর, ত্যাগ কর এই নির্বীর্যতা! উঠিয়া দাঁড়াও, সংগ্রাম কর।’ —এই তাৎপর্যপূর্ণ শ্লোকটি দ্বারাই গীতার সূচনা। যুক্তিতর্ক করিতে গিয়া অর্জুন উচ্চতর নৈতিক ধারণার প্রসঙ্গ আনিলেনঃ প্রতিরোধ করা অপেক্ষা

প্রতিরোধ না করা কত ভাল, ইত্যাদি। তিনি নিজেকে সমর্থন করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তিনি কৃষ্ণকে ভুল বুঝাইতে পারিলেন না। কৃষ্ণ পরমাত্মা, স্বয়ং ভগবান্। তিনি অবিলম্বেই অর্জুনের যুক্তির আসল রূপ ধরিয়া ফেলিলেন—ইহা দুর্বলতা। অর্জুন নিজের আত্মীয়স্বজনকে দেখিয়া অস্ত্রাঘাত করিতে পারিতেছেন না।

অর্জুনের হৃদয়ে কর্তব্য আর মায়ার দ্বন্দ্ব। আমরা যতই পক্ষিসুলভ মমতার নিকটবর্তী হই, ততই ভাবাবেগে নিমজ্জিত হই। ইহাকে আমরা 'ভালবাসা' বলি। আসলে ইহা আত্ম-সম্মোহন। জীবজন্তুর মত আমরাও আবেগের অধীন। বৎসের জন্য গাভী প্রাণ দিতে পারে—প্রত্যেকটি জীবই পারে। তাহাতে কি? অন্ধ পক্ষিসুলভ ভাবাবেগ পূর্ণত্বে লইয়া যাইতে পারে না। অনন্তচৈতন্যলাভই মানবের লক্ষ্য। সেখানে আবেগের স্থান নাই, ভাবালুতার স্থান নাই, ইন্দ্রিয়গত কোন কিছুর স্থান নাই, সেখানে কেবল বিশুদ্ধ বিচারের আলো, সেখানে মানুষ আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত।

অর্জুন এখন আবেগের অধীন। অর্জুনের হওয়া উচিত আরও অধিক আত্ম-সংযমী, বিচারের চিরন্তন আলোকোদ্ভাসিত পথচারী একজন জ্ঞানী ঋষি, তিনি এখন তাহা নহেন। হৃদয়ের তাড়নায় মস্তিষ্ককে বিচলিত করিয়া, নিজেকে ভ্রান্ত করিয়া, 'মমতা' প্রভৃতি সুন্দর আখ্যায় নিজের দুর্বলতাকে আবৃত করিবার চেষ্টা করিয়া তিনি শিশুর মত হইয়াছেন, পশুর মত হইয়াছেন। কৃষ্ণ তাহা দেখিতেছেন। অর্জুন সামান্য বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মত কথা বলিতেছেন, বহু যুক্তির অবতারণা করিতেছেন; কিন্তু তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা অজ্ঞের কথা।

'জ্ঞানী ব্যক্তি জীবিত বা মৃত কাহারও জন্যই শোক প্রকাশ করেন না।' 'তোমার মৃত্যু হইতে পারে না, আমারও না। এমন সময় কখনও ছিল না, যখন আমরা ছিলাম না। এমন সময় কখনও আসিবে না, যখন আমরা থাকিব না। ইহজীবনে মানুষ যেমন শৈশবাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে যৌবন ও বার্ধক্য অতিক্রম করে, তেমনি মৃত্যুতে সে দেহান্তর গ্রহণ করে মাত্র। জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাতে মুহ্যমান হইবে কেন?' এই যে আবেগপ্রবণতা তোমায় পাইয়া বসিয়াছে, ইহার মূল কোথায়? ইন্দ্রিয়গ্রামে। 'শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুখ—

এ-সকলের অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়স্পর্শ হইতেই অনুভূত হয়। তাহারা আসে এবং যায়।'৬এইক্ষণে মানুষ দুঃখী, আবার পরক্ষণেই সুখী। এরূপ অবস্থায় সে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না।

'যাহা চিরকাল আছে (সৎ), তাহা নাই—এরূপ হইতে পারে না; আবার যাহা কখনও নাই (অসৎ), তাহা আছে—এরূপ হইতে পারে না। সুতরাং যাহা এই সমগ্র বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে, তাহা আদি-অন্তহীন ও অবিনাশী বলিয়া জানিবে। এই বিশ্বে এমন কিছুই নাই যাহা অপরিবর্তনীয় আত্মাকে পরিবর্তিত করিতে পারে। এই দেহের আদি ও অন্ত আছে, কিন্তু যিনি দেহের মধ্যে বাস করেন, তিনি অনাদি ও অবিনশ্বর।'

ইহা জানিয়া মোহ ত্যাগ কর এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, পশ্চাৎপদ হইও না—ইহাই আদর্শ। ফল যাহাই হোক, কর্ম করিয়া যাও। নক্ষত্রগণ কক্ষচ্যুত হইতে পারে, সমগ্র জগৎ আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে, তাহাতে কিছু আসে যায় না। মৃত্যু তো শুধু দেহান্তরপ্রাপ্তি মাত্র! যুদ্ধ করিতে হইবে। ভীরুতা ও কাপুরুষতা দ্বারা কিছুই লাভ করা যায় না। পশ্চাদপসরণের দ্বারা কোন বিপদ দূর করা যায় না। দেবতাদের নিকট তোমরা অহরহ আকুল প্রার্থনা করিতেছ, তাহাতে কি তোমাদের দুঃখ দূর হইয়াছে? ভারতের জনসাধারণ কোটি ছয়েক দেবতার কাছে কান্নাকাটি করা সত্ত্বেও কুকুর-বিড়ালের মত দলে দলে মরিতেছে। দেবতারা কোথায়? তাঁহারা তখনই আগাইয়া আসেন, যখন তুমি নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পার। দেবতাদের কি প্রয়োজন?

কুসংস্কারের কাছে এই নতিস্বীকার করা, নিজের মনের কাছে নিজেকে বিকাইয়া দেওয়া তোমার শোভা পায় না। হে পার্থ! তুমি অনন্ত, অবিনশ্বর; তোমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। অনন্তশক্তিশালী আত্মা তুমি; ক্রীতদাসের মত ব্যবহার তোমায় শোভা পায় না। উঠ, জাগো, দুর্বলতা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর। যদি মৃত্যু হয় হউক। সাহায্য করিবার কেহ নাই। তুমিই তো জগৎ। কে তোমায় সাহায্য করিতে পারে? 'জীবগণের অস্তিত্ব শরীর উৎপত্তির পূর্বে এবং মৃত্যুর পরে অব্যক্ত থাকে। শুধু মাঝখানের স্থিতিকালটুকু ব্যক্ত। কাজেই তাহাতে শোকের কারণ কিছুই নাই।'

‘ কেহ এই আত্মাকে আশ্চর্যরূপে দেখেন, কেহ ইহাকে আশ্চর্যরূপে বর্ণনা করেন, অপর কেহ এই আত্মাকে আশ্চর্যরূপে শ্রবণ করেন, আবার অনেকে শুনিয়াও ইহাকে জানিতে পারেন না।’

কিন্তু এই আত্মীয়স্বজনকে বধ করা যে পাপ—এ-কথা বলার তোমার অধিকার নাই; কারণ তুমি ক্ষত্রিয় এবং বর্ণাশ্রম-অনুযায়ী যুদ্ধ করাই তোমার স্বধর্ম। ... ‘সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয় তুল্য জ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও।’

এখানে গীতার অন্য একটি বিশেষ মতবাদের সূচনা করা হইতেছে—অনাসক্তির উপদেশ। অর্থাৎ আমরা কার্যে আসক্ত হই বলিয়া আমাদের কর্মফল ভোগ করিতে হয়। ... ‘কেবল যোগযুক্ত হইয়া কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করিলে কর্মবন্ধন ছিন্ন হয়।’ সমস্ত বিপদ তুমি অতিক্রম করিতে পারিবে। ‘এই নিষ্কাম কর্মযোগের অল্পমাত্র অনুষ্ঠান করিয়া মানব জন্মমরণরূপ সংসারের ভীষণ আবর্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করে।’

‘হে অর্জুন, কেবলমাত্র নিশ্চয়াত্মিকা একনিষ্ঠ বুদ্ধি সফলকাম হয়। অস্থিরচিত্ত সকাম ব্যক্তিগণের মন সহস্র বিষয়ে নিবিষ্ট হওয়ায় শক্তির অপচয় ঘটে। অবিবেকীরা বেদোক্ত কর্মে অনুরক্ত; স্বর্গাদি ফলের জনক বেদের কর্মকাণ্ডের বাহিরে কিছু আছে, এ-কথা তাঁহারা বিশ্বাস করে না। কারণ তাঁহারা বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের সাহায্যে ভোগসুখ ও স্বর্গলাভ করিতে চান এবং সেজন্য যজ্ঞাদি করেন।’ ‘এই সকল লোক যতক্ষণ না বৈষয়িক ভোগ-সুখের প্রত্যাশা ত্যাগ করেন, ততক্ষণ তাঁহাদের আধ্যাত্মিক জীবনে সাফল্য আসিতে পারে না।’

ইহাও গীতার আর একটি মহান্ উপদেশ। বিষয়ের ভোগসুখ যতক্ষণ না পরিত্যক্ত হয়, ততক্ষণ আধ্যাত্মিক জীবন আরম্ভ হয় না। ইন্দ্রিয়-সম্ভোগে সুখ কোথায়? ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের ভ্রম সৃষ্টি করে মাত্র। মানুষ মৃত্যুর পরে স্বর্গলোকেও একজোড়া চক্ষু ও নাসিকার কামনা করে। অনেকের কল্পনা—এ-জগতে যতগুলি ইন্দ্রিয় আছে, স্বর্গে গিয়া তদপেক্ষা বেশীসংখ্যক ইন্দ্রিয় পাওয়া যাইবে। অনন্তকাল ধরিয়া সিংহাসনে অসীম ভগবানকে—

ভগবানের পার্থিব দেহকে তাঁহারা দেখিতে চান। এই সকল লোকের বাসনা—শরীরের জন্য, শরীরের ভোগসুখের জন্য, খাদ্য ও পানীয়ের জন্য। স্বর্গ তাহাদের নিকট পার্থিব জীবনের বিস্তারমাত্র। মানুষ ইহজীবনের অতিরিক্ত কিছু চিন্তা করিতে পারে না। এই শরীরকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের জীবনের সব-কিছু। 'মুক্তিপ্রদ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি এই শ্রেণীর মানবের নিকট একান্ত দুর্লভ।'

'বেদ সত্ত্ব, রজঃ ও তম—এই ত্রিগুণাত্মক বিষয়গুলি শিক্ষা দেয়।' বেদ কেবল প্রকৃতির অন্তর্গত বিষয়গুলি শিক্ষা দেয়। পৃথিবীতে যাহা দেখা যায় না, লোকে তাহা ভাবিতে পারে না। স্বর্গ লইয়া কথা বলিতে গেলে, তাহাদের মনে জাগে—সিংহাসনে একজন রাজা বসিয়া আছেন, আর লোক তাঁহার নিকট ধূপ জ্বালাইতেছে। সবই প্রকৃতি; প্রকৃতির বাহিরে কিছুই নাই। কাজেই বেদ প্রকৃতি ভিন্ন অন্য কিছু শিক্ষা দেয় না। 'এই প্রকৃতির পারে যাও; অস্তিত্বের এই দ্বৈত-ভাবের পারে যাও; তোমার ব্যক্তিগত চেতনার পারে যাও; কোন কিছুকে গ্রাহ্য করিও না, মঙ্গল বা অমঙ্গলের দিকে তাকাইও না।'

আমরা নিজদিগকে দেহের সহিত অভিন্নভাবে দেখিতেছি। আমরা দেহমাত্র, অথবা দেহটি আমাদের, আমার দেহে চিমটি কাটিলে আমি চীৎকার করি। এ-সকলই অর্থশূন্য, কারণ আমি আত্মস্বরূপ। দেহকে আত্মার সহিত অভিন্নভাবে চিন্তা করার জন্যই এই দুঃখ-শোক কল্পনা, প্রাণী দেবতা দানব, এই বিশ্বজগৎ—প্রত্যেকটি জিনিষ আসিয়া পড়িয়াছে। আমি চৈতন্যস্বরূপ। তুমি চিমটি কাটিলে আমি কেন লাফাইয়া উঠিব? ... এই দাসত্ব লক্ষ্য কর। লজ্জা হয় না তোমার? আমরা নাকি ধার্মিক! আমরা নাকি দার্শনিক! আমরা নাকি ঋষি! ভগবান্ মঙ্গল করুন—আমরা কী? জীবন্ত নরক বলিতে যাহা বুঝায়, আমরা তাহাই। পাগল বলিতে যাহা বুঝায়, আমরা তাহাই।

আমরা আমাদের শরীরের 'ধারণা' ছাড়িতে পারি না। আমরা পৃথিবীতেই বদ্ধ আছি। এই সংস্কারগুলিই আমাদের বন্ধন। এই-জাতীয় সহস্র সংস্কারের বন্ধনে বদ্ধ অবস্থায় আমরা শরীর ছাড়িয়া যাই।

একেবারে আসক্তিশূন্য হইয়া কে কাজ করিতে পারে? ইহাই প্রকৃত প্রশ্ন। ঐরূপ (আসক্তিশূন্য) ব্যক্তির নিকট কর্মের সফলতা ও বিফলতা সমান কথা। যদি সারা জীবনের কর্ম একমুহূর্তে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, তাহা হইলেও ঐ ব্যক্তির হৃৎপিণ্ডে বারেকের জন্যও বৃথা স্পন্দন জাগে না। 'ফলের কথা চিন্তা না করিয়া যিনি কর্মের জন্য কর্ম করিয়া যান, তিনিই যোগী। এইভাবে তিনি জন্মমৃত্যুর যন্ত্রণাকে অতিক্রম করেন—এইভাবে তিনি মুক্ত হন।' তখন তিনি দেখিতে পান যে, সকল প্রকার আসক্তিই মিথ্যা মায়া। আত্মা কখনও আসক্ত হইতে পারেন না। ... তারপর তিনি সকল শাস্ত্র ও দর্শনের পারে গমন করেন।

গ্রন্থ ও শাস্ত্রের দ্বারা যদি মন বিভ্রান্ত হয়—এক মহা আবর্তের মধ্যে আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে এইসব শাস্ত্রের সার্থকতা কি? কোন শাস্ত্র এই প্রকার বলে, অন্যটি আর এক প্রকার বলে। কোন্ গ্রন্থ অবলম্বন করিবে? একাকী দণ্ডায়মান হও। নিজের আত্মার মহিমা দেখ! তোমার কর্ম করিতে হইবে, তবেই তুমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইবে।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কে?' 'যিনি সকল বাসনা ত্যাগ করিয়াছেন। কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না, এমন কি এই জীবনও নয়, স্বাধীনতা নয়, দেবতা নয়, কর্ম নয়, কোন কিছুই নয়; যখন তিনি পরিতৃপ্ত, তখন আর অধিক কিছু চাহিবার তাঁহার নাই।' তিনি আত্মার মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং নিজের মধ্যে সংসার দেবতা স্বর্গ—সকলই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তখন দেবতারা আর দেবতা থাকেন না, মৃত্যু আর মৃত্যু থাকে না, জীবন আর জীবন থাকে না। প্রত্যেকটি জিনিষই পরিবর্তিত হইয়া যায়। 'যদি কাহারও ইচ্ছা দৃঢ় হয়, তাঁহার মন যদি দুঃখে বিচলিত না হয়, যদি তিনি কোন প্রকার সুখের আকাঙ্ক্ষা না করেন, যদি তিনি সকল প্রকার আসক্তি, সকল প্রকার ভয়, সকল প্রকার ক্রোধ হইতে মুক্ত হন, তবে তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞা বলা হয়।'

'কচ্ছপ যেমন করিয়া তাহার পাগুলিকে অভ্যন্তরে টানিয়া লয়, তাহাকে আঘাত করিলে একটি পা-ও বাহিরে আসে না, ঠিক তেমনি যোগী তাঁহার ইন্দ্রিয়গুলিকে অভ্যন্তরে টানিয়া লইতে পারেন।' কোন কিছুই ঐ (ইন্দ্রিয়)-গুলিকে জোর করিয়া বাহিরে আনিতে পারে

না। কোন প্রলোভন বা কোনকিছুই তাঁহাকে টলাইতে পারে না। সারা বিশ্ব তাঁহার চতুর্দিকে চূর্ণ হইয়া যাক, উহা তাঁহার মনে একটি তরঙ্গও সৃষ্টি করিবে না।

অতঃপর একটি অতিপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। অনেক সময় লোকে বহুদিন ধরিয়া উপবাস করে, কোন নিকৃষ্ট ব্যক্তি কুড়ি দিন উপবাস করিলে বেশ শান্ত হইয়া উঠে। এই উপবাস আর আত্মপীড়ন—সারা পৃথিবীর লোক করিয়া আসিতেছে। কৃষ্ণের ধারণায় এইসব অর্থশূন্য। তিনি বলেনঃ যে মানুষ নিজের উপর উৎপীড়ন করে, তাহার নিকট হইতে ইন্দ্রিয়গুলি কিছুকালের জন্য নিবৃত্ত হয়, কিন্তু বিশগুণ অধিক শক্তি লইয়া পুনঃপ্রকাশিত হয়। তখন তুমি কি করিবে? ভাবখানা এই যে, স্বাভাবিক হইতে হইবে। কৃচ্ছসাধন নহে। অগ্রসর হও, কর্ম কর, কেবল দৃষ্টি রাখিও যেন আসক্ত হইয়া না পড়। যে ব্যক্তি অনাসক্তির কৌশল জানে না বা তাহার সাধনা করে না, তাহার প্রজ্ঞা কখনও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

আমি বাহিরে গিয়া চোখ মেলিলাম, যদি কিছু থাকে, আমি অবশ্যই দেখিতে পাইব, না দেখিয়া পারি না। মন ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে ধাবিত হয়। এখন ইন্দ্রিয়গুলিকে যে-কোন প্রকার প্রকৃতি-জাত প্রতিক্রিয়া বর্জন করিতে হইবে।

‘ যাহা সংসারের নিকট অন্ধকার রাত্রি, সংযমী পুরুষ তাহাতে জাগরিত থাকেন। ইহা তাঁহার নিকট দিবালোক। আর যে বিষয়ে সারা সংসার জাগ্রত, তাহাতে সংযমী নিদ্রিত।’২০ এই সংসার কোথায় জাগ্রত?—ইন্দ্রিয়ে। মানুষ চায় ভোজন, পান আর সন্তান; তারপর কুকুরের মত মরে। ... কেবল ইন্দ্রিয়-ব্যাপারেই তাহারা সর্বদা জাগ্রত। তাহাদের ধর্মও ঐজন্যই। তাহারা আরও কামিনী, আরও কাঞ্চন, আরও সন্তান লাভের জন্য একটি ভগবান্ আবিষ্কার করিয়াছে। অধিকতর দেবত্বলাভে সাহায্য করিবার জন্য ভগবানকে চায় নাই।

‘যেখানে সারা জগৎ জাগ্রত, সেখানে যোগী নিদ্রিত, যেখানে অজ্ঞেরা নিদ্রিত, যোগী সেখানে জাগ্রত’; সেই আলোকের রাজ্যে—যেখানে মানুষ নিজেকে পাখীর মত, পশুর মত

শরীর মাত্র বলিয়া দেখে না–দেখে অনন্ত মৃত্যুহীন অমর আত্মারূপে। এখানে অজ্ঞেরা সুপ্ত; তাহাদের বুঝিবার সময় নাই, বুদ্ধি নাই, সাধ্য নাই। সেখানে কেবল যোগীই জাগ্রত থাকেন, তাহাই তাঁহার নিকট দিবালোক।

‘পৃথিবীর নদীগুলি অবিরত তাহাদের জলরাশি সমুদ্রে ঢালিতেছে, কিন্তু সমুদ্রের সুন্দর গম্ভীর প্রকৃতি অবিচলিত, অপরিবর্তিতই থাকে। তেমনি ইন্দ্রিয়গুলি একযোগে প্রকৃতির সকল সংবেদন আনিলেও জ্ঞানীর হৃদয় কোনপ্রকার বিক্ষেপ বা ভয়ের কথা ভাবিতে পারে না।’ লক্ষ লক্ষ স্রোতে দুঃখ আসুক, শত শত স্রোতে সুখ আসুক! আমি দুঃখের অধীন নই–আমি সুখের ক্রীতদাসও নই।

গীতা–৩

[১৯০০ খ্রীঃ ২৯ মে সান ফ্রান্সিস্কোতে প্রদত্ত বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত অনুলিপি]

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ আপনি আমাকে কর্মের উপদেশ দিতেছেন, অথচ ব্রহ্মজ্ঞানকে জীবনের উচ্চতম অবস্থা বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। হে কৃষ্ণ, যদি জ্ঞানকে কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তবে কর্মের উপদেশ দিতেছেন কেন?

শ্রীকৃষ্ণঃ অতি প্রাচীনকাল হইতে দুইটি সাধনপথ প্রচলিত আছে। জ্ঞানানুরাগী দার্শনিকগণ জ্ঞানযোগের এবং নিষ্কামকর্মিগণ কর্মযোগের কথা বলেন। কিন্তু কর্ম ত্যাগ করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারে না। এ-জীবনে কর্ম বন্ধ করিয়া থাকা মুহূর্তমাত্র সম্ভব নয়। প্রকৃতির গুণগুলিই মানুষকে কর্ম করিতে বাধ্য করে। যে ব্যক্তি বাহ্য কর্ম বন্ধ করিয়া মনে মনে কর্মের কথা চিন্তা করে, সে কিছুই লাভ করিতে পারে না। সে মিথ্যাচারী হইয়া যায়। কিন্তু যিনি মনের শক্তি দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে ধীরে ধীরে বশীভূত করিয়া কর্মে নিযুক্ত করেন, তিনি পূর্বোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব তুমি কর্ম কর।

'যদি তুমি এ রহস্য বুঝিয়া থাক যে, তোমার কোন কর্তব্য নাই–তুমি মুক্ত, তথাপি অপরের কল্যাণের জন্য তোমাকে কর্ম করিতে হইবে। কারণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যাহা আচরণ করেন, সাধারণ লোকে তাহাই অনুসরণ করে।'

পরা শান্তির অধিকারী মুক্ত মহাপুরুষ যদি কর্মত্যাগ করেন, তবে যাহারা সেই জ্ঞান ও শান্তি লাভ করে নাই, তাহারা মহাপুরুষকে অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিবে এবং তাহাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইবে।

'হে পার্থ, ত্রিভুবনে আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই, তথাপি আমি সর্বদা কর্মে ব্যাপৃত আছি। যদি আমি মুহূর্তের জন্য কর্ম না করি, তবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইয়া যাইবে।' ২৫

'অজ্ঞ ব্যক্তিরা ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া যেরূপ কর্ম করে, জ্ঞানিগণকে অনাসক্তভাবে এবং কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া সেইরূপ কর্ম করিতে হইবে।'

আপনি যদি জ্ঞানের অধিকারী হন, তবু অজ্ঞান ব্যক্তিদের বালসুলভ বিশ্বাসকে বিভ্রান্ত করিবেন না। পরন্তু তাহাদের স্তরে নামিয়া আসিয়া তাহাদিগকে ক্রমশঃ উন্নত করিবার চেষ্টা করুন। ইহা একটি অতিশয় শক্তিশালী ভাব, এবং ভারতে ইহাই আদর্শ হইয়া গিয়াছে। তাই দেখা যায়, ভারতবর্ষে জ্ঞানী মহাপুরুষগণ মন্দিরে যান, প্রতিমাপূজাও করেন—ইহা কপটতা নয়।

গীতার পরবর্তী অধ্যায়ে পড়ি, শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেনঃ যাঁহার ভক্তিপূর্বক অন্যান্য দেবতার পূজা করেন, তাঁহারা বস্তুতঃ আমারই পূজা করেন।২৭ এই ভাবে মানুষ সাক্ষাৎ ভগবানেরই পূজা করিতেছে। ভগবানকে ভুল নামে ডাকিলে কি তিনি ক্রুদ্ধ হইবেন? যদি ক্রুদ্ধ হন, তবে তিনি ভগবান্ নহেন। এ কথা কি বুঝিতে পার না, মানুষের হৃদয়ে যাহা আছে, তাহাই ভগবান্?—যদিও ভক্ত শিলাখণ্ড পূজা করিতেছে, তাহাতে কি আসে যায়?

ধর্ম কতকগুলি মতবাদের সমষ্টি—এই ধারণা হইতে যদি আমরা একবার মুক্ত হইতে পারি, তবেই বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব। ধর্মের একটি ধারণাঃ আদি মানব আদম জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়াছিলেন বলিয়াই পৃথিবীর সৃষ্টি—আর পালাইবার পথ নাই। যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করুন—অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যুতে বিশ্বাস করুন! কিন্তু ভারতে ধর্মের ধারণা অন্যরূপ। সেখানে ধর্ম মানে অনুভূতি, উপলব্ধি; অন্য কিছু নয়। চার ঘোড়ার জুড়িগাড়ীতে, বৈদ্যুতিক শকটে অথবা পদব্রজে—কিভাবে লক্ষ্যে পৌঁছিলেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। উদ্দেশ্য এক। খ্রীষ্টানদের পক্ষে সমস্যা—কিভাবে এই ভীষণ ঈশ্বরের ক্রোধ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে। ভারতীয়দের সমস্যা—নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করা এবং নিজেদের হারান আত্মভাবকে ফিরিয়া পাওয়া।

আপনি কি উপলব্ধি করিয়াছেন—আপনি আত্মা? যদি বলেন—'হাঁ', তবে 'আত্মা' বলিতে আপনি কি বোঝেন? আত্মা কি এই দেহ-নামক মাংসপিণ্ড, অথবা অনাদি অনন্ত চিরশান্ত

জ্যোতির্ময় অমৃতত্ব? আপনি শ্রেষ্ঠ দার্শনিক হইতে পারেন, কিন্তু যতক্ষণ আপনি নিজেকে এই দেহ মনে করিতেছেন, ততক্ষণ আপনি আপনার পায়ের নীচের ঐ ক্ষুদ্র কীটের সমান। এ অপরাধের মার্জনা নাই, আপনার অবস্থা আরও শোচনীয়; কারণ আপনি দর্শনশাস্ত্র সবই জানেন, অথচ দেহবোধ হইতে ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিতেছেন না। শরীরই আপনার ভগবান্–ইহাই আপনার পরিচয়! ইহা কি ধর্ম?

আত্মাকে আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করাই ধর্ম। আমরা কি করিতেছি? ঠিক ইহার বিপরীত। আত্মাকে জড়বস্তুরূপে অনুভব করিতেছি! অমৃতস্বরূপ ঈশ্বর হইতে আমরা মৃত্যু ও জড়বস্তু নির্মাণ করি, এবং প্রাণহীন জড়বস্তু হইতে চেতন আত্মা 'সৃষ্টি' করি!

ঊর্ধ্ববাহু ও হেঁটমুণ্ড হইয়া কঠোর তপস্যা দ্বারা অথবা ত্রিমুণ্ডধারী পাঁচ হাজার দেবতার আরাধনা দ্বারা যদি ব্রহ্মবস্তু উপলব্ধি করা সম্ভব হয়, তবে সানন্দে ঐগুলিকে গ্রহণ করুন। যেভাবেই হউক, আত্মজ্ঞান লাভ করুন। এ বিষয়ে কোন সমালোচনার অধিকার কাহারও নাই। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেনঃ যদি তোমার সাধন-পদ্ধতি উচ্চতর ও উন্নততর হয় এবং অপরের পদ্ধতি খুব খারাপ বলিয়াই মনে হয়, তথাপি তাহার নিন্দা করিবার কোন অধিকার তোমার নাই।

ধর্ম কতকগুলি অর্থহীন শব্দের সমষ্টি নয়, পরন্তু ধর্মকে ক্রমবিকাশ বলিয়া মনে করিতে হইবে। দুই সহস্র বৎসর পূর্বে এক বিশিষ্ট ব্যক্তির ঈশ্বরদর্শন হইয়াছিল; মুশাও (Moses) দাবাগ্নির মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিয়াছিলেন। মুশা ঈশ্বরদর্শন করিয়া যাহা করিয়াছিলেন, তাহাতে কি আপনাদের পরিত্রাণ হইয়াছে? অপরের ঈশ্বরদর্শনের কথা আপনাদের মধ্যে প্রেরণা দিয়া ঈশ্বরদর্শন করিবার জন্য উৎসাহিত করিতে পারে, এতদ্ব্যতীত আর এতটুকু সাহায্য করিতে পারে না। পূর্ববর্তী মহাপুরুষগণের দৃষ্টান্তগুলির ইহাই মূল্য, আর বেশী কিছু নয়। সাধনার পথে এইগুলি নির্দেশক-স্তম্ভ মাত্র। একজন আহার করিলে যেমন অপরের ক্ষুধা দূর হয় না, তেমনি একজনের ঈশ্বরদর্শনে অপরের মুক্তি হয় না। নিজেকেই ঈশ্বরদর্শন করিতে হইবে। তাঁহার একটি শরীরে তিনটি মাথা অথবা ছয়টি দেহে পাঁচটি মাথা–ভগবানের প্রকৃতি সম্বন্ধে এইরূপ অর্থহীন কলহেই এই-সকল লোক প্রবৃত্ত হয়।

আপনি কি ঈশ্বরদর্শন করিয়াছেন? না। ... এবং লোকে বিশ্বাস করে না যে, তাহারা কখনও ঈশ্বরকে দর্শন করিতে পারে। মর্ত্যের মানুষ আমরা কি নির্বোধ! নিশ্চয়ই, পাগলও বটে!

ভারতবর্ষে এই ঐতিহ্য চলিয়া আসিতেছে—যদি ঈশ্বর থাকেন, তবে তিনি অবশ্যই আপনারও ঈশ্বর, আমারও ঈশ্বর। সূর্য কাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি? আপনারা বলেন, শ্যাম খুড়ো সকলেরই খুড়ো। যদি ঈশ্বর থাকেন, তবে নিশ্চয় আপনি তাঁহাকে দেখিতে পারেন, নতুবা সেরূপ ঈশ্বরের চিন্তাই করিবেন না।

প্রত্যেকে মনে করেন, তাঁহার পথই শ্রেষ্ঠ পথ। খুব ভাল! কিন্তু মনে রাখিবেন—ইহা আপনার পক্ষেই ভাল হইতে পারে। একই খাদ্য যাহা একজনের পক্ষে দুষ্পাচ্য, অপরের পক্ষে তাহা সুপাচ্য। যেহেতু ইহা আপনার পক্ষে ভাল, অতএব আপনার পদ্ধতিই প্রত্যেকের অবলম্বনীয়—সহসা এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিবেন না। জ্যাকের কোট সবসময় জন বা মেরীর গায়ে না-ও লাগিতে পারে। যাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা নাই, যাহারা চিন্তা করে না—এরূপ নরনারীকে জোর করিয়া এই রকম একটা ধরাবাঁধা ধর্মবিশ্বাসের ভিতর ঢুকাইয়া দেওয়া হয়! স্বাধীনভাবে চিন্তা করুন; বরং নাস্তিক বা জড়বাদী হওয়াও ভাল, তবু বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহার করুন! এ ব্যক্তির পদ্ধতি ভুল—এ-কথা বলিবার অধিকার আপনার আছে? আপনার নিকট ইহা ভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু ইহার নিন্দা করিবার অধিকার আপনার নাই। অর্থাৎ এই মত অবলম্বন করিলে আপনার অবনতি হইবে; কিন্তু এ-কথা বলা যায় না যে, ঐ ব্যক্তিও অবনত হইবে; তাই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশঃ যদি তুমি জ্ঞানী হও, তবে একজনের দুর্বলতা দেখিয়া তাহাকে মন্দ বলিও না।

যদি পার তাহার স্তরে নামিয়া তাহাকে সাহায্য কর। ক্রমে ক্রমে তাহাকে উন্নত হইতে হইবে। পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে আমি হয়তো তাহার মগজে পাঁচ ঝুড়ি তথ্য সরবরাহ করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে তাহার কী ভাল হইবে? পূর্বাপেক্ষা হয়তো তাহার অবস্থা খারাপই হইবে।

কর্মের এই বন্ধন কোথা হইতে আসে? আমরা আত্মাকে কর্মদ্বারা শৃঙ্খলিত করি। আমাদের ভারতীয় মতে সত্তার দুইটি দিক্—একদিকে প্রকৃতি, অন্যদিকে আত্মা। প্রকৃতি বলিতে শুধু বহির্জগতের বস্তুসমূহ বোঝায় না; আমাদের শরীর মন বুদ্ধি—এমন কি 'অহঙ্কার' পর্যন্ত এই প্রকৃতির অন্তর্গত। অনন্ত জ্যোতির্ময় শাশ্বত আত্মা এই সকলের ঊর্ধ্বে। এই মতে আত্মা প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, আত্মা চিরকাল ছিলেন এবং চিরকাল থাকিবেন। ... কোন সময়েই আত্মাকে মনবুদ্ধির সহিতও অভিন্নরূপে গণ্য করা যায় না ...(দেহের সঙ্গে তো দূরের কথা)।

ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, আমাদের ভুক্ত খাদ্যই চিরকাল মন সৃষ্টি করিতেছে; মন জড়পদার্থ। আত্মার সহিত খাদ্যের কোন সম্পর্ক নাই। খাওয়া বা না খাওয়া, চিন্তা করা বা না করা ... তাহাতে আত্মার কিছু আসে যায় না। আত্মা অনন্ত জ্যোতিঃস্বরূপ। এই জ্যোতি চিরকাল সমভাবে থাকে। আলোর সম্মুখে নীল বা সবুজ—যে কাঁচ দিয়াই দেখ না কেন, তাহাতে আলোর কিছু আসে যায় না; মূল আলোর রঙ অপরিবর্তনীয়। মনই বিভিন্ন পরিবর্তন আনে—নানা রঙ দেখায়। আত্মা যখন এই দেহ ত্যাগ করে, তখন এ-সবই টুকরা টুকরা হইয়া যায়।

প্রকৃতিরও প্রকৃত স্বরূপ আত্মা। সৎস্বরূপ আত্মাই জীবাত্মারূপে (আমাদের শরীর-মনের মধ্য দিয়া) চলা ফেরা করে, কথা বলে এবং সব কিছু কর্ম করে। জীবাত্মার শক্তি, মন-বুদ্ধি ও প্রাণই জড়ের দ্বারা বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হইতেছে। যদিও চেতন আত্মা আমাদের চিন্তা, শারীরিক কর্ম ও সব-কিছুর কারণ, যদিও আত্মার জ্যোতি সর্বত্র প্রতিফলিত, তথাপি ভালমন্দ সুখ-দুঃখ শীত-উষ্ণ প্রভৃতি প্রকৃতিগত যাবতীয় দ্বন্দ্ব ও দ্বৈতভাব আত্মাকে স্পর্শ করে না।

'হে অর্জুন, এই সমস্ত ক্রিয়া প্রকৃতির অন্তর্গত। আমাদের শরীর মনের মধ্য দিয়া প্রকৃতি তাহার নিয়মানুসারে কাজ করিয়া চলিতেছে। আমরা প্রকৃতির সহিত নিজদিগকে অভিন্ন মনে করিয়া বলিতেছি—আমি এই সকল কর্মের কর্তা। এইভাবে আমরা ভ্রান্তির কবলে পড়ি।'

কোন না কোন কিছুর বাধ্য হইয়াই আমরা কর্ম করি। ক্ষুধা বাধ্য করে, তাই আমি খাই। দুঃখভোগ হীনতার দাসত্ব। প্রকৃত ‘আমি’ (আত্মা) চিরদিন মুক্ত। কে তাহাকে কর্মে বাধ্য করিতে পারে? কারণ সুখ-দুঃখের ভোক্তা তো প্রকৃতির অন্তর্গত। যখন আমরা দেহের সহিত নিজেকে অভিন্ন বলিয়া ভাবি, তখনই বলি, ‘আমি অমুক, আমি এই দুঃখভোগ করিতেছি। এইরূপ যত বাজে কথা।’ কিন্তু যিনি সত্যকে জানিয়াছেন, তিনি নিজেকে সব কিছু হইতে পৃথক্ করিয়া রাখেন। তাঁহার শরীর কি করে বা মন কি ভাবে, তাহা তিনি গ্রাহ্য করেন না। কিন্তু মানব-সমাজের এক বিরাট অংশই ভ্রান্তির বশীভূত; যখনই তাহারা কোন ভাল কাজ করে, তখন নিজেদের ইহার কর্তা বলিয়া মনে করে। তাহারা এখনও উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব বুঝিতে পারে না, তাহাদের বিশ্বাস বিচলিত করিও না। মন্দ ছাড়িয়া তাহারা ভাল কাজ করিতেছে; খুব ভাল, তাই করুক! ... তাহারা কল্যাণকর্মী। ক্রমশঃ তাহারা বুঝিবে, ইহা অপেক্ষা আরও গৌরব আছে। তাহারা সাক্ষিমাত্র—কাজ স্বতই হইয়া যায়, ক্রমশঃ তাহারা বুঝিবে। যখন অসৎকর্ম একেবারে ত্যাগ করিয়া কেবল সৎকর্ম করিতে থাকিবে, তখনই তাহারা বুঝিতে আরম্ভ করিবে যে, তাহারা প্রকৃতির ঊর্ধ্বে। তাহারা কর্তা নয়, তাহারা কর্ম হইতে পৃথক্, তাহারা সাক্ষিমাত্র। তাহারা শুধু দাঁড়াইয়া দেখে। প্রকৃতি হইতে বিশ্বসংসার উৎপন্ন হইতেছে। তাহারা এ-সকল হইতে উপরত। ‘হে সৌম্য, সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র সৎস্বরূপই ছিলেন আর কিছুই ছিল না। সেই সৎ ঈক্ষণ করিলেন এবং জগতের সৃষ্টি হইল।’ ‘জ্ঞানীও প্রকৃতির দ্বারা চালিত হইয়া কার্য করে। প্রত্যেকেই প্রকৃতির অনুযায়ী কার্য করে। কেহ প্রকৃতিতে অতিক্রম করিতে পারে না।’ অণুও প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারে না। কি অন্তর্জগতে, কি বহির্জগতে অণুকেও নিয়ম মানিতেই হইবে। ‘বাহিরের সংযমে কি হইবে?’

জীবনে কোন কিছুর মূল্য কিসের দ্বারা নির্ণীত হয়? ভোগসুখ বা ধনসম্পদের দ্বারা নয়। সব জিনিষ বিশ্লেষণ করুন। দেখিবেন আমাদের শিক্ষার জন্য অভিজ্ঞতা ছাড়া কোন কিছুরই মূল্য নাই। অনেক সময় ভোগসুখ অপেক্ষা দুঃখকষ্টই আমাদের আরও ভাল

অভিজ্ঞতা দেয়। অনেক সময় সুখাস্বাদ অপেক্ষা আঘাতগুলিই আমাদের জীবনে মহত্তর শিক্ষা দিয়া থাকে। দুর্ভিক্ষেরও একটা মূল্য আছে।

শ্রীকৃষ্ণের মতে আমরা একেবারে সদ্যোজাত নূতন জীব নই। আমাদের সত্তা পূর্বেও ছিল। আমাদের মনবুদ্ধিও একেবারে নূতন নয়। আধুনিক বিজ্ঞান বলে যে, প্রত্যেকটি শিশু কেবল অতীত মানব-জীবনের অভিজ্ঞতা নয়, তাহার পূর্ববর্তী উদ্ভিদ্-জীবনের অভিজ্ঞতা এবং স্মৃতিও সঙ্গে লইয়া আসে। তাহার সংস্কারে অতীত অধ্যায়গুলি সব আছে—বর্তমান অধ্যায় আছে, আর আছে সম্মুখে ভবিষ্যতের অনেকগুলি অধ্যায়। প্রত্যেকের জীবনপথ পূর্ব হইতেই পরিকল্পিত, মানচিত্রে আঁকা রহিয়াছে। এই অন্ধকার সত্ত্বেও কোন ঘটনা বা অবস্থার উদ্ভব কারণ ব্যতীত হইতে পারে না। অজ্ঞানই ইহার কারণ। কার্যকারণের অন্তহীন শৃঙ্খলে একটির পর একটি শিকলি বাঁধা রহিয়াছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এইরূপ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। কার্য ও কারণের বিশ্বব্যাপী এই শৃঙ্খলের একটি শিকলি আপনি ধরিয়াছেন, আমি আর একটি। ঐ শৃঙ্খলের সেই অংশটুকু আমাদের নিজস্ব প্রকৃতি।

এখন শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেনঃ নিজের প্রকৃতিগত পথে চলিতে চলিতে মরাও ভাল। অপরের পথ অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিও না।এই আমার নিজের পথ এবং তাহাতেই আমি চলিতেছি। আপনি উপরের পথে চলিতেছেন। নিজের পথ ছাড়িয়া আমি ঐ পথে যাইতে সর্বদা প্রলুব্ধ হইতেছি এবং ভাবিতেছি আপনার সহযাত্রী হইব। যদি আমি ওখানে যাই, তবে আমি 'ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ' হইব। এই সম্বন্ধে আমাদের সচেতন হইতে হইবে। এ-সবই ক্রমোন্নতির কথা। উন্নতির পথ ধীরে ধীরে। অপেক্ষা করুন, সব পাইবেন। নতুবা পরের পন্থা অবলম্বন করিলে আধ্যাত্মিক জীবনে বিপদ দেখা দিবে। ধর্ম শিক্ষা দিবার এইটি মৌলিক রহস্য।

মানুষের পরিত্রাণ বলিতে আপনারা কি বোঝেন? সকলকে একই ধর্মমতে বিশ্বাস করিতে হইবে? কখনই তাহা নয়। অবশ্য এমন কতকগুলি উপদেশ বা আদর্শ আছে, যেগুলি সমগ্র মানবসমাজের পক্ষে প্রযোজ্য। যথার্থ আচার্য আপনার প্রকৃতি এবং কোন্ পথ আপনার পক্ষে শ্রেয়, তাহা বলিয়া দিতে পারেন। আপনি হয়তো নিজের প্রকৃত স্বরূপ জানেন না;

আপনারা নিজদিগকে যে সাধনপথের অধিকারী বলিয়া ভাবিতেছেন, তাহা ভুলও হইতে পারে। এ বিষয়ে এখনও আপনার চেতনা বিকশিত হয় নাই। কিন্তু প্রকৃত আচার্যকে উহা জানিতে হইবে। আপনাকে একবার দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিবেন, আপনি কোন্ পথের অধিকারী, এবং তিনিই আপনাকে সেই পথ ধরাইয়া দিবেন। অন্ধকারে পথ খুঁজিয়া এধারে ওধারে নানাপ্রকার চেষ্টা করিলেও আমরা এতটুকু অগ্রসর হইতে পারি না। তারপর যথাসময়ে সদগুরুর জীবন-প্রবাহে পড়িয়া আমরা দ্রুত অগ্রসর হই। ঈশ্বর-কৃপায় নিদর্শন এই যে, অনুকূল স্রোত পাইবার শুভ মুহূর্তে আমরা ভাসিয়া থাকি। তারপর আর সংগ্রাম নাই। সেই পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ঐ পথ ত্যাগ করিয়া অন্য পথ অবলম্বন করা অপেক্ষা বরং ঐ পথে (চলিতে চলিতেই) মরিতে হইবে।

কিন্তু সাধারণতঃ কি হয়? আমরা একটি ধর্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিয়া কতকগুলি ধরাবাঁধা মত স্থাপন করি, মানুষের প্রকৃত লক্ষ্য ভুলিয়া যাই। সকলকে এক প্রকৃতির মনে করিয়া, সেরূপ ব্যবহার করি। কিন্তু দুইটি মানুষের কখনও একই দেহ, একই মন হয় না; দুইটি ব্যক্তির ধর্ম বা সাধনপথ কখনও এক হইতে পারে না। যদি ধর্মপথে অগ্রসর হইতে চান, তবে কোন সংগঠিত ধর্মের (organized religion) দ্বারস্থ হইবেন না। ঐগুলি দ্বারা ভাল অপেক্ষা শতগুণ মন্দই হইয়া থাকে, কারণ উহাতে ব্যক্তিগত উন্নতি রুদ্ধ হইয়া যায়। মনোযোগের সহিত সব কিছু দেখুন, কিন্তু নিজের পথে নিষ্ঠা রাখুন। যদি আমার পরামর্শ শোনেন, তবে কোন ফাঁদে পা দিবেন না। যখনই কোন সম্প্রদায় তাহাদের ফাঁস পরাইবার জন্য চেষ্টা করিবে, তখনই নিজেকে সেখান হইতে মুক্ত করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান। যেমন মধুকর বহু ফুল হইতে মধু সংগ্রহ করে, অথচ কোন ফুলে আবদ্ধ হয় না, তেমনই সংগঠিত, ধর্মে প্রবেশ করুন, কিন্তু আবদ্ধ হইবেন না। ধর্ম আপনাকে ও আপনার ঈশ্বরকে লইয়া; কোন তৃতীয় ব্যক্তি আপনাদের উভয়ের মধ্যে আসিবে না। একবার ভাবিয়া দেখুন—এই সংগঠিত ধর্মগুলি কী করিয়াছে! কোন নেপোলিয়নের অত্যাচার এই সকল ধর্মীয় নির্যাতন অপেক্ষা ভয়ঙ্কর ছিল—যদি আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হই, অমনি অপরকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করি। একজনকে ভালবাসার অর্থ যদি অপরকে ঘৃণা করাই বুঝায়, তার চেয়ে ভাল না বাসাই ভাল। এ ভালবাসা নয়, নরক! যদি নিজের লোকগুলিকে ভালবাসার

অর্থ অপর সকলকে ঘৃণা করা, তবে তাহা নিছক স্বার্থপরতা ও পশুত্ব; ইহার ফলে পশুতে পরিণত হইতে হইবে। অতএব অপরের ধর্ম যতই বড় বলিয়া মনে হউক না কেন, তাহা অবলম্বন করা অপেক্ষা নিজের (গুণগত) ধর্ম পালন করিয়া মরাও শ্রেয়।

'অর্জুন, সাবধান! কাম ও ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু। ইহাদিগকে সংযত করিতে হইবে। ইহারা বিজ্ঞ ব্যক্তিদের বিবেকও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। এই কামের অনল দুষ্পূরণীয়। ইন্দ্রিয়সমূহে এবং মনে কামের অধিষ্ঠান। আত্মা কিছুই কামনা করেন না।'

'পুরাকালে এই যোগ আমি সূর্যকে শিখাইয়াছিলাম। সূর্য উহা (রাজর্ষি) মনুকে শিক্ষা দেন। এইভাবে যোগের জ্ঞান এক রাজা হইতে অন্য রাজায় পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিয়াছে; কিন্তু কালক্রমে যোগের মহৎ শিক্ষা নষ্ট হইয়া যায়। তাই আজ আমি আবার তোমার নিকট তাহা বলিতেছি।'

তখন অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি এরূপ বলিতেছেন কেন? আপনি তো সেদিন জন্মিয়াছিলেন, এবং (সূর্য আপনার বহু পূর্বে জন্মিয়াছেন)—আপনি সূর্যকে এই যোগ শিখাইয়েছেন, তাহা কিরূপে সম্ভব?'

উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেনঃ হে অর্জুন, আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে; তুমি সেগুলি সম্বন্ধে সচেতন নও। আমি অনাদি জন্মরহিত সর্বভূতের অধীশ্বর। নিজ প্রকৃতি-সহায়ে আমি দেহধারণ করি। যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি মানুষকে সাহায্য করিবার জন্য আবির্ভূত হই। সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতির বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। যে যে-ভাবে আমাকে পাইতে চায়, সেই ভাবেই আমি তাহার কাছে যাই। কিন্তু হে পার্থ, জানিও কেহই আমার পথ হইতে কখনও বিচ্যুত হইতে পারে না।

কেহ কখনও বিচ্যুত হয় নাই। আমরাই বা কিরূপে হইব? কেহই ভগবানের পথ হইতে বিচ্যুত হয় না।

সকল সমাজই একটা যা তা করিয়া খাড়া করা সাধারণ নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। ত্রুটিহীন সাধারণীকরণের উপরই (যথার্থ) নিয়ম গঠিত হইতে পারে। প্রাচীন প্রবাদ কি? প্রত্যেক নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। যদি উহা সত্যই নিয়ম হয়, তবে তাহা লঙ্ঘন করা যায় না। কেহই উহা লঙ্ঘন করিতে পারে না। আপেল কি মাধ্যাকর্ষণের বিধি কখনও লঙ্ঘন করে? নিয়ম লঙ্ঘিত হইলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব আর থাকে না। এক সময় আসিবে, যখন আপনি নিয়ম লঙ্ঘন করিবেন, এবং সেই মুহূর্তে আপনার চেতনা মন ও দেহ বিলীন হইয়া যাইবে।

ঐ তো একজন চুরি করিতেছে। কেন সে চুরি করে? আপনারা তাহাকে শাস্তি দেন। কেন, আপনারা তাহার কর্মশক্তি কি কোন কাজে লাগাইতে পারেন না? আপনারা বলিবেন, সে পাপী। অনেকেই বলিবেন, সে আইন লঙ্ঘন করিয়াছে। বিশাল মানবগোষ্ঠীকে জোর করিয়া (বৈচিত্র্যহীন) একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। সেই জন্যই এত সব দুঃখ যন্ত্রণা পাপ ও দুর্বলতা। পৃথিবীকে যতটা খারাপ বলিয়া মনে করা হয়, পৃথিবী কিন্তু ততটা খারাপ নয়। মূর্খ আমরা পৃথিবীকে এতটা খারাপ করিয়াছি। আমরা নিজেরাই ভূতপ্রেত দৈত্যদানব সৃষ্টি করি, এবং পরে তাহাদের হাত হইতে অব্যাহতি পাই না। আমরা নিজেদের চোখ থাকিয়া চীৎকার করি, 'কেহ আসিয়া আমাদিগকে আলো দেখান।'– নির্বোধ! চোখ হইতে হাত সরাইয়া লও! তাহা হইলেই সব ঠিক হইয়া যাইবে। আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আমরা দেবতাদের আহ্বান করি, কেহই নিজের উপর দোষারোপ করে না। বাস্তবিক ইহাই দুঃখের বিষয়। সমাজে এত মন্দ কেন? মন্দ কাহাকে বলে?–দেহসুখ ও শয়তানি ভাব। মন্দকে প্রাধান্য দাও কেন? মন্দগুলিকে এত বড় করিয়া দেখিতে কেহ তো বলে নাই। 'হে অর্জুন, আমার পথ হইতে কেহই সরিয়া যাইথে পারে না।' আমরা নির্বোধ, আমাদের পথও নির্বোধের পথ। এই সব মায়ার ভিতর দিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। ভগবান্ স্বর্গই সৃষ্টি করিয়াছেন, মানুষ নিজের জন্য নরক সৃষ্টি করিয়াছে।

'কোন কর্ম আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কর্মফলে আমার স্পৃহা নাই। যে-কেহ আমাকে এইভাবে জানে, সে কর্মকৌশল জানে এবং কর্মদ্বারা কখনও আবদ্ধ হয় না। প্রাচীন ঋষিগণ এই তত্ত্ব জানিয়া নির্বিঘ্নে কর্মে নিযুক্ত হইতেন। হে অর্জুন, তুমি সেইভাবে কর্ম কর।'

'যিনি প্রচণ্ড কর্মে গভীর শান্তভাব এবং গভীর শান্তভাবে প্রচণ্ড কর্ম দর্শন করেন, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী।' এখন প্রশ্ন এইঃ প্রতিটি ইন্দ্রিয় প্রতিটি স্নায়ু কর্মপরায়ণ হইলেও আপনার মনে গভীর প্রশান্তি আছে কি?—কোন কিছু আপনার মনকে চঞ্চল করে না তো? কর্মচঞ্চল বাজারের রাস্তায় দাঁড়াইয়া গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, চারিদিকে ভিড় ঘুরপাক খাইতেছে, তাহার মধ্যে আপনার মন কি ধ্যানমগ্ন ধীর ও শান্ত? অথবা গিরিগুহায় স্তব্ধ নীরবতার মধ্যে কি আপনার মন তীব্রভাবে ক্রিয়াশীল? যদি এইরূপ হয়, তবে আপনি যোগী—মুক্ত পুরুষ, নতুবা নন।

'যাঁহার প্রত্যেকটি কর্মপ্রচেষ্টা বন্ধনহীন, ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ও স্বার্থরহিত, সত্যদ্রষ্টাগণ তাঁহাকেই জ্ঞানী বলিয়া থাকেন।' যতক্ষণ স্বার্থবোধ থাকিবে, ততক্ষণ আমাদের নিকট প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হইবে না। নিজেদের অহঙ্কার দ্বারা আমরা সবকিছুকে রঞ্জিত করি। বস্তুগুলি নিজস্ব রূপেই আমাদের নিকট উপস্থিত হয়; তাহারা যে আবৃত তাহা নয়, কিছুই আবৃত থাকে না। আমরা তাহাদিগকে আবৃত করি। আমাদের মনবুদ্ধির তুলি দিয়া ভিন্নভাবে তাহাদিগকে চিত্রিত করি। যে-সকল জিনিষ আমরা পছন্দ করি না, সেগুলি কাছে আসিলে আমরা সেগুলির উপর একটু তুলি বুলাইয়া দিই, তারপর সেগুলির দিকে তাকাইয়া থাকি। ... আমরা কোন কিছু জানিতে চাই না। সব জিনিষকে আমরা নিজের রঙে রাঙাইয়া লই। স্বার্থই সকল কর্মের প্রেরণাশক্তি। বস্তুর স্বরূপ আমাদের দ্বারাই আবৃত রহিয়াছে, গুটিপোকার মত নিজেদের চারিদিকে জাল সৃষ্টি করিয়া আমরা তাহার মধ্যে আবদ্ধ হই। গুটিপোকা তাহার নিজের জালেই নিজে আবদ্ধ হয়। আমরাও ঠিক তাহাই করিতেছি। যখনই 'আমি' শব্দটি উচ্চারণ করি, তখনই একটি পাক খাইল। 'আমি ও আমার' বলামাত্র আর এক পাক খাইল। এইরূপে চলিতে থাকে।

কাজ না করিয়া আমরা এক মুহূর্ত থাকিতে পারি না। কাজ করিতেই হইবে। কিন্তু প্রতিবেশী যখন বলে, 'এস, সাহায্য কর', তখন মনে যে ভাব উদিত হয়, নিজেকে সাহায্য করিবার সময়ও সেই ভাব পোষণ করিবেন। ইহার বেশী নয়। অপরের শরীর অপেক্ষা আপনার শরীর বেশী মূল্যবান নয়। অপরের দেহের জন্য যতটুকু করিয়া থাকেন, নিজের শরীরের জন্য তার বেশী করিবেন না। ইহাই ধর্ম।

'যাঁহার সকল কর্মপ্রচেষ্টা ফলতৃষ্ণা ও স্বার্থবুদ্ধি রহিত, তিনিই জ্ঞানাগ্নি দ্বারা কর্মের এই সকল বন্ধন দগ্ধ করিয়াছেন, তিনি জ্ঞানী।' শুধু পুস্তকপাঠের দ্বারা এই অবস্থা লাভ হয় না।একটি গর্দভের পৃষ্ঠে গোটা গ্রন্থাগারটি চাপাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, তাহাতে সে মোটেই জ্ঞানী হইয়া উঠিবে না। কাজেই বহু পুস্তক পড়িবার প্রয়োজন কি? 'কর্মে আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক সর্বদা পরিতৃপ্ত থাকিয়া এবং কোন লাভের প্রত্যাশা না করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি কর্ম করেন, অথচ কর্মের ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন।'

মাতৃগর্ভ হইতে উলঙ্গ অবস্থায় এই পৃথিবীতে আসিয়াছিলাম, উলঙ্গ অবস্থাতেই ফিরিয়া যাইব। অসহায় অবস্থায় আসিয়াছিলাম, অসহায় অবস্থাতেই চলিয়া যাইব। এখনও আমি অসহায়। আমাদের গন্তব্য কোথায়, লক্ষ্য কি—এ অবস্থার কথা চিন্তা করাও আমাদের পক্ষে ভয়াবহ। কত অদ্ভুত অদ্ভুত ভাব আমাদের পাইয়া বসে, তাহাও আমরা জানি না। আমরা প্রেতাত্মার মিডিয়ামের কাছে যাই—ভূত-প্রেত যদি কোন সাহায্য করিতে পারে। ভাবুন কী দুর্বলতা! ভূতপ্রেত, শয়তান, দেবতা—সব এস! পুরোহিত, ভণ্ড, হাতুড়ে—যে যেখানে আছ, সকলে এস! যে মুহূর্তে আমরা দুর্বল হই ঠিক তখনই তাহারা আমাদের পাইয়া বসে এবং যত দেবতা আমদানি করে।

আমার দেশে দেখিয়াছি, কেহ হয়তো শক্তিমান্ ও শিক্ষিত হইয়া দার্শনিকভাবে বলে, 'এই সব প্রার্থনা পুণ্যস্নানাদি অর্থহীন।' ... তারপর তাহার পিতা দেহত্যাগ করিলেন, তাহার মাতৃ-বিয়োগ হইল। হিন্দুর পক্ষে এই শোক এক প্রচণ্ড আঘাত। তখন দেখা যাইবে পূর্বোক্ত ব্যক্তি প্রতিটি কর্দমাক্ত কুণ্ডে স্নান করিতেছে, মন্দিরে যাইতেছে, সকলের দাসত্ব

করিতেছে–যে পার, সাহায্য কর! কিন্তু আমরা অসহায়! কাহারও নিকট হইতে কোন সাহায্য আসে না। ইহাই সত্য।

মানুষের সংখ্যা হইতে দেবতার সংখ্যা বেশী, তবুও কোন সাহায্য আসে না। কুকুরের মত আমরা মরি, তবু কোন সাহায্য নাই। সর্বত্র পশুর মত ব্যবহার, দুর্ভিক্ষ রোগ দুঃখ অসৎভাব! সকলেই সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতেছে, কিন্তু কোন সাহায্য নাই। কোন আশা না থাকিলেও আমরা সাহায্যের জন্য চীৎকার করিয়া চলিয়াছি। কি শোচনীয় অবস্থা! কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! নিজেদের অন্তরে অনুসন্ধান করুন। আমাদের এই দঃখ-কষ্টের অর্ধেকের জন্য আমরা দোষী নই; পিতামাতাই দায়ী। আমরা এই দুর্বলতা লইয়া জন্মিয়াছি–এবং পরে আরও বেশী দুর্বলতা আমাদের মাথায় ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

নিজেকে অসহায় মনে করা–দারুণ ভুল। কাহারও কাছে সাহায্য চাহিও না। আমরা নিজেরাই নিজেদের সাহায্য করি। যদি তাহা না পারি, তবে আমাদের সাহায্য করিবার কেহ নাই।

‘তুমি নিজেকে তোমার একমাত্র বন্ধু এবং তুমি নিজেই তোমার একমাত্র শত্রু। আত্মা বা মন ছাড়া অন্য কোন শত্রু নাই, আত্মা বা বন্ধু ছাড়া অন্য কোন বন্ধু নাই।’৪২ ইহাই শেষ ও শেষ উপদেশ। কিন্তু ইহা শিখিতে কত কালই না লাগে! অনেক সময় মনে হয়, এই আদর্শ আমরা যেন ধরিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু পরমুহূর্তে পুরাতন সংস্কার আসিয়া পড়ে। আমাদের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া যায়। দুর্বল হইয়া আবার সেই ভ্রান্ত সংস্কার ও অপরের সাহায্যকেই আঁকড়াইয়া ধরি। অপরের সাহায্য পাইব, এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া আমাদের যে বিরাট দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন! পুরোহিত তাদের নিয়মমত পূজা বা প্রার্থনার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সম্ভবতঃ কিছু প্রত্যাশা করে। ষাট হাজার লোক আকাশের দিকে তাকাইয়া প্রার্থনা করে এবং প্রার্থনান্তে পুরোহিতের প্রাপ্য অর্থ দেয়। মাসের পর মাস লোক আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে, প্রার্থনা করে ও পুরোহিতকে টাকা দেয়; একবার ভাবিয়া দেখুন! ইহা কি পাগলামি নয়? পাগলামি ছাড়া ইহাকে আর কি বলা যায়? ইহার জন্য দায়ী কে? আপনারা ধর্মপ্রচার করিতে পারেন, ইহা

শুধু অপরিণত শিশুদের মন উত্তেজনা করা! ইহার জন্য আপনাদের দুঃখ ভোগ করিতেই হইবে। অন্তরের অন্তস্তলে আপনারা কি? যে দুর্বল চিন্তাগুলি আপনি অন্যের মাথায় ঢুকাইয়া দিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটির জন্য আপনাকে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ সহ মূল্য দিতে হই বে। কর্মের নিয়ম তাহার প্রাপ্য আদায় করিবেই।

জগতে একটিমাত্র পাপ আছে, তাহা দুর্বলতা। বাল্যকালে যখন মহাকবি মিল্টনের ‘প্যারাডাইস লষ্ট’ কাব্য পড়িয়াছিলাম, তখন শয়তানকেই একমাত্র সৎ ব্যক্তি বলিয়া শ্রদ্ধা করিতাম। তিনিই মহাপুরুষ, যিনি কখনও দুর্বলতার বশীভূত হন না, সর্বপ্রকার বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হন এবং জীবনপণ করিয়া সংগ্রাম করেন। ওঠ, জাগ, ঐ প্রকার সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও ...। পাগলের সংখ্যা আর বাড়াইও না। যে অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী, তাহার সহিত আর তোমার দুর্বলতা যুক্ত করিও না। জগতের কাছে আমি এই কথা বলিতে চাই। শক্তিমান্ হও; ভূতপ্রেত ও শয়তানের কথা তোমরা যে বল, আমরাই তো জীবন্ত শয়তান। শক্তি ও ক্রমোন্নতিই জীবনের চিহ্ন। দুর্বলতা মৃত্যুর চিহ্ন, যাহা কিছু দুর্বল, তাহাকে এড়াইয়া চল। উহাই মৃত্যু। উহা যদি শক্তি হয়, তবে তাহার জন্য নরকেও যাও এবং শক্তি লাভ কর। সাহসীরাই মুক্তির অধিকারী। ‘বীরপুরুষরাই স্ত্রীরত্নলাভের যোগ্য।’ আর যাহারা সর্বাপেক্ষা বীর, শুধু তাহারাই মুক্তিলাভের যোগ্য। কাহার নরক? কাহার অত্যাচার? কাহার পাপ? কাহার দুর্বলতা? কাহার মৃত্যু কাহার রোগ?

আপনারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, যদি যথার্থ বিশ্বাস করিতেই হয়, তবে প্রকৃত ঈশ্বরে বিশ্বাসী হউন। ‘তুমি পুরুষ, তুমি স্ত্রী, তুমি সবল যুবকের পদবিক্ষেপে চলিতেছ, আবার জারগ্রস্ত বৃদ্ধ দণ্ডসহায়ে চলিতেছ।’ তুমিই দুর্বলতা, তুমিই ভয়, তুমিই স্বর্গ এবং তুমিই নরক; তুমি সর্প হইয়া দংশন কর, রোজা হইয়া বিষমুক্ত কর—তুমিই ভয়-মৃত্যু ও দুঃখ-রূপে উপস্থিত হও।

সকল দুর্বলতা, সকল বন্ধনই আমাদের কল্পনা। সজোরে একটি কথা বল, ইহা শূন্যে মিলাইয়া যাইবে। দুর্বল হইও না, ওঠ, বাহির হইবার আর অন্য কোন পথ নাই। শক্ত হইয়া দাঁড়াও, শক্তিমান্ হও ভয় নাই। কুসংস্কার নাই। নগ্ন সত্যের সম্মুখীন হও। দুঃখ-

কষ্টের চরম–মৃত্যু যদি আসে, আসুক। প্রাণপণ সংগ্রামের জন্য আমরা কৃতসঙ্কল্প। ধর্ম বলিতে আমি ইহাই জানি, আমি ইহা লাভ করি নাই, লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছি। আমি সফল হইতে না পারি, তোমরা পারিবে। অগ্রসর হও।

'যেখানে একজন অপরকে দেখে এবং একজন অপরকে শোনে, যতক্ষণ দ্বৈতবোধ আছে, ততক্ষণ ভয় থাকিবেই, এবং ভয়ই সমস্ত দুঃখের কারণ।'

যখন যেখানে একজন অপরকে দেখে না, যেখানে সবাই এক–সেখানে দুঃখী হইবার কেহ নাই, অসুখী হইবারও কেহ নাই। একই আছেন, দ্বিতীয় নাই–'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। কাজেই ভয় করিও না; ওঠ, জাগ, যে পর্যন্ত লক্ষ্যস্থলে না পঁহুছিতেছ, সে পর্যন্ত থামিও না।